Vol. 26 | No. 1 | 1982

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশে সাহিত্যগবেষণার ধারা

Volume	26
Issue	1
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ভীষ্মদেব চৌধুরী
Published online	December 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v26i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i1.7
Pages	119-177
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশে সাহিত্যগবেষণার ধারা

ভীষ্মদেব চৌধুরী

ভূমিকা

বর্তমান-নিবন্ধ ১৯৪৭ থেকে ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালপরিসরে ব্যাপ্ত বাংলাদেশের সাহিত্য-গবেষণার প্রাসঙ্গিক মূল্যায়ন এবং পরিচয় দানের প্রয়াস। এ-নিবন্ধ মূলতঃ ইতিহাসমূলক ও মূল্যায়নপ্রবণ গবেষণাগ্রন্থ-নির্ভর; অর্থাৎ বাংলাভাষায় সম্পন্ন গবেষণা-কর্মের গ্রন্থরূপ বর্তমান আলোচনার উপজীব্য। আবিষ্কৃত পুথি ও সংগৃহীত লোকসাহিত্যের সম্পাদনা সাহিত্যগবেষণার পর্যায়ভুক্ত হলেও এ-ধারা আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। গবেষক সর্বদাই সত্যসন্ধ; তিনি আলোকসম্পাতনকারী আবিষ্কারক কিম্বা মূল্যায়ন-প্রয়াসী, কিন্তু চূড়ান্তসিদ্ধান্তের নির্দেশক নন।[১] আমাদের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ পর্যবেক্ষণ, সত্যানুসন্ধান এবং মূল্যায়ন। উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার বিকাশধারা অদ্যাবধি অব্যাখ্যাত; ক্ষুদ্রকায়-প্রবন্ধে এ-সম্পর্কিত আলোচনা খণ্ডিত এবং বিরলদৃষ্ট গ্রন্থ প্রধানতঃ তথ্যপূর্ণ।

এ-দেশের পঁয়ত্রিশ বছরের সাহিত্যগবেষণা মিশ্রভাবে সাফল্য ও ব্যর্থতাজ্ঞাপক। গৃহীত তথ্যের পর্যবেক্ষণ এবং সত্য-আবিষ্কার যাবতীয় গবেষণাকার্যের লক্ষ্য। মেধা ও মনন-চর্চায় কোন জাতি যখন উৎকর্ষে পৌঁছায় তখনই সৃষ্ট হয় সত্যসন্ধানী গবেষকের, সাফল্য আসে গবেষণায়। ঐ কালসীমায় বাংলাদেশে যথার্থ সাহিত্যগবেষণার স্বল্পতা জাতির বোধ ও বোধির স্তরকে অভিব্যক্ত করে। পূর্বের উক্তি নৈরাশ্যসূচক হলেও একথা স্বীকার্য যে, মননচর্চার দৈন্য সত্ত্বেও মননশীল গবেষকের কল্যাণে সার্থক-সম্পাদিত গবেষণার দৃষ্টান্ত এদেশে একেবারেই বিরল নয়। উল্লিখিত হয়েছে, মেধার উৎকর্ষই সৃষ্টি করে গবেষক ও গবেষণা; সৃষ্টিশীল প্রতিভার তুলনায় সমালোচকদের দ্বিতীয় পংক্তির প্রতিভা[২] হিসেবে আখ্যায়নে আমরা তাই সম্মত নই। এ-ধরনের বিভাজন বিজ্ঞান-প্রসূত নয়; কেননা শিল্পীর সাধনা সৃষ্টিতে, গবেষকের আরাধনা সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে। গবেষক বর্তমানে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করেন অতীত, প্রত্যক্ষ করেন প্রমাণ-সাপেক্ষ ভবিষ্যৎ--তাঁর কর্ম সন্দেহাতীতভাবে দুরূহ।[৩]

বিশ শতকের ব্রিটিশশাসিত পূর্ব-বাংলার নবোত্থিত মধ্যবিত্ত বাঙালির রাজনীতি-সমাজ-নীতি-সংস্কৃতি-সচেতনতাই নির্মাণ করেছে এ-অঞ্চলের নতুন ইতিহাস। বস্তুতঃ, নবীন মধ্যবিত্ত বাঙালি এবং তারই অংশ নব-প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯২১) মেধা-সচেতন, মুক্তবুদ্ধি ছাত্রসমাজের গতিচাঞ্চল্যের মধ্যেই বিধৃত হ'য়ে আছে ব্রিটিশশাসিত পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক উৎসধারার পরিচয়। বিশেষতঃ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ (১৯২১) এবং সামন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বিক্ষত বুর্জোয়া মানবতাবাদী চৈতন্যের ধারক[৪] 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬)-এর বুদ্ধির মুক্তি-আন্দোলন ও সে-আন্দোলনের মুখপত্র 'শিখা' (১৯২৬), ব্রিটিশশাসিত পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচনায় পালন করেছে অগ্রণী ভূমিকা।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে পূর্ব-বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ প্রথম প্রশস্ত হয়। বস্তুতঃ, ঐ-প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি-প্রাপ্ত মেধাবী ছাত্রসমাজই উত্তরকালে রচনা করেছে এদেশের সাহিত্যগবেষণার পরিবেশ। বলা আবশ্যক, উচ্চশিক্ষা-গ্রহণের সূচনাপর্বে সাহিত্যগবেষণায় আত্মনিয়োগের প্রশ্ন অবান্তর। তাই লক্ষ্য করি, সূচনাপর্বে তথা ১৯২১ থেকে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ২৬ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুধু বাংলা-সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বি. এ. অনার্স এবং এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেছেন যথাক্রমে ৩৩ ও ৮৯ জন বাঙালি ছাত্র।[৫] পক্ষান্তরে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তান-অন্তর্গত পূর্ব-বাংলায় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যে বি. এ. অনার্স ও এম. এ. ডিগ্রী অর্জন করেছেন মোট ২,৩৪০ জন শিক্ষার্থী।[৬]

এই পরিসংখ্যান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা-গ্রহণে এ-অঞ্চলের বাঙালি শিক্ষার্থীর ক্রমবর্ধমান আগ্রহের স্মারক এবং একই সঙ্গে পাকিস্তান-অন্তর্গত পূর্ব-বাংলায় উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের পরিচায়ক। অবশ্য আগ্রহ এবং তাগিদেই যে সবাই ডিগ্রি লাভ করেছেন এমন নয়; সমকালীন শৈক্ষিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতাও অন্যমনস্ক শিক্ষার্থীদের সাহিত্য-অধ্যয়নে বাধ্য করেছে। তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, পাকিস্তান অন্তর্গত পূর্ব-বাংলাতেই উচ্চতর পর্যায়ে সাহিত্য-অনুশীলনের সূচনা, ফলতঃ, ঐ-শাসন-কালেই এ-অঞ্চলের সাহিত্যগবেষণার বিকাশ।

ব্রিটিশশাসিত পূর্ব-বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্গত হওয়ার পর, এদেশের সাহিত্যগবেষণা ক্রমপ্রসার লাভ ক'রলেও এর একটি উজ্জ্বল পটভূমি এ-অঞ্চলে সূচিত হয়েছিল পশ্চিম-বঙ্গের কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যগবেষণার অনুপ্রেরণায়। কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য-গবেষণার সূচনাকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ; সে-সময়কালের সাহিত্যগবেষণা প্রধানতঃই প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুথি ও লোকসাহিত্য আবিষ্কার এবং সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় পরিব্যাপ্ত, উল্লেখযোগ্য ইতিহাস-রচনার এ-ধারা বিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাচীন পুথি ও লোকসাহিত্য আবিষ্কার এবং সাহিত্যগবেষণা যাঁদের শ্রমনিষ্ঠা ও মেধায় ভিত্তি স্থাপন ও প্রসার লাভ করেছিল তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯), সুশীলকুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮), সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ অন্যতম।

সাহিত্যগবেষণার উল্লিখিত অনুপ্রেরণাই ব্রিটিশশাসিত পূর্ব-বাংলায় সৃষ্টি করেছে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯), মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ (১৮৯৮-১৯৭৪), মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (১৯০৪), মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২) প্রমুখ সাহিত্যগবেষকের।

ব্রিটিশশাসিত পূর্ব-বাংলায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই একমাত্র সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব, যিনি মধ্যযুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের পুথি সংগ্রহে প্রথম আত্মনিয়োগ করেন। পর-বর্তীকালে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ পারস্য-সাহিত্য বিষয়ে তাঁর গবেষণা সম্পন্ন করেন। মুহম্মদ এনামুল হক সাহিত্যবিশারদ-সহযোগে রচনা করেন মধ্যযুগের আরাকান-রাজ্যে 'মুসলিম কবি' রচিত রোম্যান্সমূলক আখ্যানকাব্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এবং মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন আবিষ্কার করেন বাংলা লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। বস্তুত ঐ পঞ্চ-ব্যক্তিত্বই এ-অঞ্চলের সাহিত্যগবেষণার পথনির্মাতার দাবীদার। তাঁদের শ্রমকল্যাণে স্বল্প যে গবেষণাকর্মের ফসল প্রকাশিত হয়েছিল, তা-ই উত্তরকালে পাকিস্তান-অন্তর্গত পূর্ব-বাংলার

সাহিত্যগবেষণার প্রধান অনুপ্রেরণা। তাই, ঐ পঞ্চ-মনীষীর সাধনার পরিচিতি বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার উৎসধারা অনুধাবনে আমাদের সাহায্য করবে।

সাহিত্যগবেষণাক্ষেত্রে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মধ্যযুগে বাঙালি মুসলমান কবিগণ কর্তৃক রচিত রোম্যান্সমূলক প্রণয়কাব্যের আবিষ্কারক এবং স্ব-আবিষ্কৃত পুথির সম্পাদক হিসেবে সমধিক পরিচিত। 'মুনশী শ্রী আবদুল করিম' নামাঙ্কিত সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সংগৃহীত পুথি-পরিচিতির সঙ্কলন 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ'-এর প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যার "নিবেদন" অংশে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে'র শ্রী ব্যোমকেশ মুস্তফী পুথি-সংগ্রহ ও তার পরিচিতি-সঙ্কলনে সাহিত্যবিশারদের শ্রমকঠিন সাধনা ও একাগ্রতার নিম্নরূপ পরিচয় দিয়েছেন :

> "...তিনি মুসলমান, কোন হিন্দুর আঙ্গিনায় তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু হিন্দুর ঘরে পুথি আছে শুনিয়া তিনি ভিখারীর মত তাঁহার দ্বারে গিয়া পুথি দেখিতে চাহিয়াছেন। পুথি সরস্বতী পূজার দিন পূজিত হয়; অতএব মুসলমানকে ছুঁইতে হইবে না বলিয়া অনেকে তাঁহাকে দেখিতেও দেন নাই। ...মুন্‌শী সাহেবের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজের কৃতজ্ঞতার পরিমাণ যে কত বেশী, তাহা ইহা হইতেই অনুমান করা যায়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, মাতৃভাষার এই নিষ্ঠাবান্, ভক্তিবান, অকৃত্রিম সাধক দীর্ঘজীবী হইয়া, মাতৃভাষার ভাণ্ডারে রত্নরাশির সঞ্চয় করিয়া ও তাহাদের পরিচয় দিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চির-কৃতজ্ঞতা-ভাজন হউন।[৭]

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যের ঐ-অজ্ঞাত সাহিত্য-সাধনার ধারাকে করেছে আলোকিত।[৮] প্রসঙ্গতঃ, মধ্যযুগের পুথিসাহিত্য-সংগ্রহে সাহিত্য-বিশারদের অবদান-ব্যাখ্যায় আহমদ শরীফের (১৯২১) বক্তব্য অনুধাবনীয়: "সাহিত্য-বিশারদ তাঁর প্রায় সব পুথি চট্টগ্রাম থেকে এবং কিছু সংখ্যক পুথি নোয়াখালী ও ত্রিপুরা থেকে সংগ্রহ করেছেন। এসব পুথিই আজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের মুখ রক্ষা করেছে। আর তাদের বুকে জাগিয়েছে ঐতিহ্যানুভূতি।"[৯] এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের পুথি-পরিচিতির পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেই মূলতঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (দ্বিতীয় খণ্ড; ১৯৬৪) এবং মুহম্মদ এনামুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (১৯৫৭) গ্রন্থ দু'খানি রচিত।[১০]

মোহম্মদ বর্‌কতুল্লাহ্-রচিত 'পারস্য-প্রতিভা' গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ড ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। বিশ্বসাহিত্যে পারস্য-প্রতিভার অবদান-ব্যাখ্যা গ্রন্থটির উপজীব্য। এর মূল্যবান সংযোজন একশত এক পৃষ্ঠাব্যাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাংশ। পারস্য-সাহিত্য-প্রতিভার মূল্যায়নের পটভূমি হিসেবে তিনি এতে ফারসি-সাহিত্যে আরবীয় দর্শনের প্রভাব, বিভিন্ন দার্শনিক ধর্মমতের প্রেরণা ও সূফীমতের উদ্ভব প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়া, 'কবি ফির্দৌসী', 'ওমর খইয়াম', 'শেখ সা'দী', 'নাসির খস্‌রু' এই প্রতিভা-চতুষ্টয়ের জীবন ও কাব্যসাধনার ইতিহাস এবং বিশ্বসাহিত্যে তাঁদের অবদানের মূল্যায়ন বর্তমান গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ। ফারসিভাষা-বিশেষজ্ঞ বলেই তিনি তাঁর এই গবেষণাকর্মে মূল ফারসি কবিতাকে অবলম্বন করেছেন, এবং জিজ্ঞাসু ও রসপিপাসু পাঠকের জন্য গযল, রুবাই ও কাব্যাংশগুলির স্ব-কৃত বঙ্গানুবাদও সংযোজন করেছেন। এ-দেশের সাহিত্যগবেষণায় মোহম্মদ বর্‌কতুল্লাহ্-ই ফারসি সাহিত্যকে নিরাসক্ত-নিরপেক্ষ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন; ফলতঃ এ-ধারায় তিনিই পথিকৃতের দাবীদার। তাঁর এই দুর্গম ও বন্ধুর গবেষণাকর্ম এ-দেশের সাহিত্যগবেষণার ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত।

বাংলা লোকসাহিত্য-সংগ্রহের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারই অনুপ্রেরণায় এ-অঞ্চলের লোকসাহিত্য সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। তাঁর শ্রমকঠিন অনুসন্ধিৎসা আবিষ্কার করেছে এ-দেশের লোকসাহিত্যের এক বিশাল জগৎ। উন্মেষ যুগের সাহিত্যগবেষণায় মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের এ-অবদান অবিস্মরণীয়। বৃটিশশাসিত পূর্ব-বাংলায় তাঁর সংগৃহীত লোকসাহিত্যের সঙ্কলন দু'টি হল 'হারামণি' (প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৩৭) এবং 'হারামণি' (দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২)।

মুহম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রণীত 'আরাকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' সে-সময়ের সাহিত্যগবেষণার সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আলোচ্য গ্রন্থে ১৬০০ থেকে ১৭০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালে পূর্ব-বঙ্গের আরাকান-রাজ্যে বাঙালি মুসলমান-কবি রচিত বাংলাসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।[১১] গ্রন্থকারদ্বয়ের পরিচয় প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হল: "এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন সাহিত্যরথী মৌলভী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ,—তিনি দ্রোণাচার্য্য সদৃশ এবং তাঁহার সহকর্ম্মী মুহম্মদ এনামুল হক্ এম-এ (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত), পি-এচ-ডি—ইনি অর্জ্জুনতুল্য।"[১২] এ-গ্রন্থে সতেরো শতকের আরাকানবাসী বাঙালি-কবির রোম্যান্সমূলক কাব্যসাধনার পরিচিতি ছাড়াও, "সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান সমাজ"-এর সামাজিক ইতিহাস ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ-অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য অংশ, পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানের তুলনায় পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানের শ্রেষ্ঠত্ব-নির্ণয়। গ্রন্থকারদ্বয় লিখেছেন: "পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের হাতে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষা যখন এইরূপ মেরুদণ্ডহীন হইয়া ক্রমশঃ দুর্গতির চরম সীমার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, (ইঁহাদের হাতে বাঙ্গালা ভাষা দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছে তাঁহাদের দ্বারা রচিত ঊনবিংশ শতাব্দীর পুথীতে) তখন পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গীয় মুসলমানদের হাতে বাঙ্গালা ভাষা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। পূর্ব্ববঙ্গে এই যুগের অন্ততঃ দুই শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা সাধারণ মুসলমানদের মাতৃভাষারূপে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু কোন কোন বিদেশাগত বা উচচ-শ্রেণীর মুসলমান তখনও বাঙ্গালা ভাষাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না বলিয়া বোধ হয়; মোল্লা সমাজ এই ভাষার বিপক্ষে "ফতোয়া" দিতেন বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ...আমাদের কবি আবদুল হাকিম তাঁহার "নূর নামা" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে কড়া ভাষায় শ্লেষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুধু পূর্ব্ব-বঙ্গীয় মুসলমানদের বঙ্গভাষা-প্রীতি ঘোষণা করিতেছে না, বরং এখনও যাহারা বাঙ্গালী মুসলমানদের ঘাড়ে উর্দ্দুর মামদো ভূত চাপাইতে চাহেন, তাঁহাদের অদ্ভুত মানসিকতাকেও ইহা বিজ্ঞ-জনোচিত বিদ্রূপ করিতেছে। ...মোটকথা, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ হইতে সাহিত্য সাধনায়, ইস্‌লামী শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও সভ্যতায় অনেকাংশে পৃথক ছিল। এই পার্থক্য পূর্ব্ববঙ্গের পক্ষে শ্রেষ্ঠতার এবং পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে হীনতার পার্থক্য।"[১৩]

ব্রিটিশশাসিত পূর্ব-বাংলার সাহিত্যগবেষণা প্রধানতঃই আবিষ্কারমুখী, অনুসন্ধানপ্রবণ এবং বিবরণ, ব্যাখ্যা ও ইতিহাসমূলক। মুষ্টিমেয় এই গবেষকদের অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করেছে বাংলাসাহিত্যে 'মুসলিম অবদানের' এবং লোকসাহিত্যের দুই বিশাল জগৎ। পাকিস্তান-অন্তর্গত পূর্ব-বাংলায় সাহিত্যগবেষণার যে-ধারা বিকশিত হয়েছে, তা মুখ্যত আমাদের আলোচিত গবেষণা-ধারারই অনুপ্রেরণা-নির্ভর।

পরিপ্রেক্ষিত

পূর্ববাংলা : পাকিস্তান-পর্যায়
এক. ১৯৪৭-১৯৫৮

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হ'লে, এ-নবীন রাষ্ট্রের অন্তর্গত হয় ব্রিটিশশাসিত পূর্ব-বাংলা। অন্তর্ভুক্তিকাল থেকেই পাকিস্তান-অন্তর্গত পূর্ব-বাংলায় লক্ষিত হয় ত্রি-ধারা-বিভক্ত রাজনৈতিক-স্রোত। সামন্তমানসপুষ্ট খাজা নাজিমুদ্দিনের (১৮৯৪-১৯৬৪) নেতৃত্বাধীন ধর্মভিত্তিক রাজনীতি-স্রোত, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধারা, এবং মানবতাবাদী সমাজতান্ত্রিক শক্তির সমবায়ে রচিত হয় এদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল।[১৪]

এই ত্রি-ধারাবিভক্ত রাজনৈতিক-পরিমণ্ডলে পাকিস্তান রচনার অব্যবহিত পরেই ধর্মীয় জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত বাঙালির ঘটে স্বপ্নভঙ্গ। পাকিস্তান-অন্তর্গত পূর্ব-বাংলায় বিভাষী শাসকগোষ্ঠীর নতুন নতুন শোষণকৌশল তথা অর্থনৈতিক প্রতিরোধ এবং জনগণের ওপর জবরদস্তিমূলক বিভাষা-চাপানোর অপপ্রয়াস ধর্মীয় জাতীয়তার স্থলে উন্মেষ ঘটায় ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের। এই নব চৈতন্যের ফলপ্রসূ পরিণাম বুর্জোয়া-মানবতাবাদী এবং মানবতাবাদী-সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক-শক্তির সম্মিলিত প্রয়াস ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলন। অতঃপর ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক-শক্তি 'যুক্তফ্রন্টে'র বিজয় এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সাংগঠনিক-শক্তি 'মুসলিম লীগে'র (১৯০৬) পরাভব, বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম ভিত্তি রচনা করে। কিন্তু বাঙালির আন্দোলনের এ-জয়যাত্রা অচিরেই তাদের অন্তর্কলহের এবং পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের শিকার হয় এবং তারই ক্রমপরিণতিতে ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের শাসনযন্ত্র অধিকার করে সামরিকবাহিনী; স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এক 'রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে'র মাধ্যমে এর নেতৃত্ব দেন। এবং এর পরবর্তী দশবছর তাঁর শাসনকালের ইতিহাস 'আইয়ুবী-দশক' নামে প্রচারিত।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল পাকিস্তান-অন্তর্গত পূর্ব-বাংলার সাহিত্য-গবেষণার ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ সময়কালের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অঙ্কুরোদ্গম বাঙালি-জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে একাংশের দ্বিধা, বিভিন্ন আদর্শের আন্তরসংঘাত—গবেষণার যথার্থ পরিবেশ নির্মাণের সহায়ক ছিল না। এ-সময়ে প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থের সংখ্যা তাই আশাব্যঞ্জক নয়। উল্লিখিত কালের মুষ্টিমেয়-গবেষণাকর্মে অভিব্যক্ত প্রধান প্রবণতা হল ঐতিহ্যসন্ধান, সাহিত্যের-ইতিহাস নির্মাণ, আবিষ্কৃত পুথির সম্পাদনা ও তার নব-মূল্যায়ন এবং সংগৃহীত লোকসাহিত্যের সঙ্কলন। আলোচ্যকালে প্রকাশিত তিনটি গবেষণামূলক গ্রন্থই বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণের প্রয়াস।[১৫] এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, পাকিস্তান-অন্তর্গত পূর্ব-বাংলার সাহিত্যগবেষণার প্রথম পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয়-সরকার গৃহীত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা-প্রকল্প[১৬] বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছে এ-সময়ের সাহিত্যগবেষণার অন্যতম প্রবণতা।

কেন্দ্রীয় সরকারের ইতিহাস-রচনা প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ঐতিহাসিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ নিরপেক্ষ-নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়ে রচনা করেছেন প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস। উল্লিখিত সময়ে এ-প্রকল্পের অধীন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (প্রথম খণ্ড, ১৯৫৩) এবং মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) ও সৈয়দ আলী আহসানের (১৯২২) 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (আধুনিক যুগ, ১৯৫৬) প্রকাশিত

হয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-রচিত 'বাংলা সাহিত্যের কথা' পাকিস্তান-অন্তর্গত পূর্ব-বাংলায় সূত্রপাত করেছে সাহিত্যগবেষণার। গ্রন্থের 'প্রথম সংস্করণের নিবেদন'-এ গ্রন্থকার লিখেছেন "আমি ১৯১৯ ইং সাল হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা ও গবেষণায় রত আছি। এই সম্বন্ধে আমার লিখিত বহু প্রবন্ধ বিবিধ পত্রিকায় ছড়াইয়া আছে। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিকে সংগ্রহ করিয়া এবং কিছু নূতন রচনা সংযোগ করিয়া এই "বাংলা সাহিত্যের কথা" প্রকাশিত হইল। বিভিন্ন সময়ের লেখা বলিয়া প্রবন্ধ-গুলির মধ্যে রচনা-রীতির পার্থক্য লক্ষিত হইবে। কিন্তু উপায় কি ? নূতন করিয়া লিখিবার সময় আমি করিতে পারি নাই।"[১৭] কিন্তু পরিমার্জিত সংস্করণে বিষয়-বস্তুর ধারাবাহিক বিন্যাস এবং প্রাজ্ঞ গবেষকের সচেতন গবেষণা-দৃষ্টি একে প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের আকর-গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বাংলাসাহিত্যের ইতি-হাসকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সীমায় বিন্যাস করেছেন। ফরাসি পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভীর একটি মতকে কেন্দ্র ক'রে তিনি বাংলা সাহিত্যের আদি লেখ্য-রূপের রচনাকাল নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। এবং ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, (১৮৯০-১৯৭৭) চর্যাগীতির আবিষ্কারক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত (১৯০২-১৯৬৬), প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮৯৮-১৯৫৬), নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখের সিদ্ধান্ত খণ্ডন ক'রে বাংলা সাহিত্যের আদি লেখ্য-রূপ চর্যাগীতি ৬৫০ থেকে ১১০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছে বলে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাস-রচয়িতার সততা এবং অকাট্য ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শহীদুল্লাহ্'র ঐ-মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বস্তুতঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত উপাত্ত অবলম্বন ক'রে বাংলা-সাহিত্যকে সুনির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে স্থাপন করার কৃতিত্ব ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র। তাঁর এ-আবিষ্কার এ-দেশের সাহিত্যগবেষণার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি 'আশ্চর্য-চর্যাচয়'-এর টীকায় উদ্ধৃত মীননাথের একটি কবিতাকে বাংলা ভাষার আদি লেখ্য-রূপ হিসেবে বিবেচনা করেছেন, তাঁর মতে, "মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার আদিম লেখক আর সহজযান মতের প্রবর্ত্তক।"[১৮] 'প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের ধারা' শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি ধর্মের নঞর্থক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সদর্থক বাংলাসাহিত্য সৃষ্টির অবদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য লক্ষণীয় :

> ধর্মের দলাদলিতে লৌকিক ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি বা পুষ্টি পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন কথা নহে। এই ভারতবর্ষেই আমরা দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৌদ্ধধর্মে পালি সাহিত্যের উৎপত্তি। ইউরোপের রোমীয় খ্রীষ্টান সংঘের সহিত বিবাদে দেশীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি। বেশী দিনের কথা নহে, প্রাচীন ধর্মের সহিত প্রতিযোগিতায় শিখ ধর্মে পাঞ্জাবী সাহিত্যের সৃষ্টি। নূতন ধর্মপ্রচারকগণ নিজেদের মত সর্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য প্রচলিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রাচীন দল সাধারণের উপর নিজেদের সাবেক দখল বজায় রাখিবার জন্য চলিত ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতেই বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল।[১৯]

তিনি আরো লিখেছেন : "বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের পূর্বে সহজিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ তাঁহাদের মত প্রচার করেন। বঙ্গের তীর্থিক ও বৌদ্ধগণের ধর্ম বিতণ্ডার ফলে উভয় ধর্মের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টায় কিংবা প্রতিবেশিতা সূত্রে উভয়ের সংমিশ্রণে পশ্চিমবঙ্গে সদ্ধর্মের এবং পূর্ববঙ্গে নাথপন্থার উৎপত্তি হয়।[২০]

এতদ্ব্যতীত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ-গ্রন্থে নির্ণয় করেছেন চর্যাগানের সাহিত্যিক মূল্য, বিশ্লেষণ করেছেন এতে বিধৃত সমাজচিত্র এবং অকাট্য ভাষাতাত্ত্বিক-প্রমাণের সাহায্যে উপস্থাপন করেছেন বৌদ্ধগানের ভাষা-বিতর্কের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দফতরের প্রকল্পভুক্ত অপর গ্রন্থ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং প্রণয়নকালে উদ্ভূত প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে গ্রন্থকারদ্বয়ের বক্তব্য অনুধাবনীয় :

> বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে মুসলিম লেখক-দেরকে নিয়ে আমাদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ কাজ সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন করার সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা হলো এই যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু ক'রে এ কাল পর্যন্ত যে সব মুসলিম লেখককে আমরা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি তাঁদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন আলোচনাতো দূরের কথা, ধারাবাহিকভাবে তাঁদের সমস্ত লেখাও আমরা পাইনি।...
>
> মুসলিম লেখকদের সম্পর্কে আমরা যে শেষ কথা বলতে পেরেছি তার দাবী আমরা করিনা। ইতিহাস পরাঙমুখ বাঙালী মুসলিম জাতির কাছে তাদের পূর্ব-পুরুষদের সাহিত্যিক সাধনার ধারাবাহিকতার একটা মোটামুটি ছবি আমরা দাঁড় করিয়েছি মাত্র। এতে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র ছাত্রী ও ভবিষ্যৎ গবেষকদের কিছুটা সুবিধা হবে, আমাদের এটুকুই ভরসা।[২১]

আলোচ্য-গ্রন্থে গ্রন্থকারদ্বয়ের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি সুগম রূপরেখা প্রণয়নের ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন থাকলেও তা সর্বাংশে সাফল্য লাভ করেনি। ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থে পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯২২) সাহিত্য-অবদান ব্যাখ্যায় তাঁদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুমিত হয়।

১৯৪৭-উত্তর প্রথম দশকের সর্বশেষ গ্রন্থ মুহম্মদ এনামুল হক-রচিত 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (১৯৫৭) বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের তথ্যনির্ভর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এদেশে এটাই প্রথম সশ্রম প্রয়াস। তুর্কি-যুগ থেকে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য-সূচির পরিধি। কোন্ আশাবাদে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এ-গ্রন্থ রচিত হয়েছে সে-সম্পর্কে গ্রন্থকার লিখেছেন : "জাতির সাংস্কৃতিক-ইতিহাসের যে-দিক এই পুস্তকে উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা এতকাল একরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। সময়ে সময়ে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে মশাল-বর্তিকার (Torch-light) সাহায্যে এই অন্ধকারে কেহ কেহ আলোক-পাত করিবার চেষ্টা পাইলেও, আমাদের এই সাংস্কৃতিক-কক্ষে কখনও কোন স্থায়ী প্রদীপ প্রজ্বলিত হয় নাই ; বিজলীবাতি বসাইবার কথা না বলাই ভালো। আমি ইহার দ্বারদেশে একটি মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া দিলাম মাত্র। কেহ ভুল করিয়া জাতির এই সাংস্কৃতিক-কক্ষের দিকে পদক্ষেপ করিলে, তিনি অন্ততঃ কক্ষটির প্রবেশ-পথ দেখিতে পাইবেন, ইহাই আমার একমাত্র আশা। কেহ যেন মনে না করেন, আমি এই প্রদীপের সাহায্যে জাতির এই অন্ধকার সাংস্কৃতিক-কক্ষ আলোকিত করিয়াছি। ইহাকে পূর্ণরূপে আলোকময় করিয়া তুলিতে আরও দুই যুগ আবশ্যক বলিয়া মনে হয়।"[২২]

'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে সাহিত্যের যুগবিভাগ করা হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনা-ক্রমের উপর ভিত্তি ক'রে। এ-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'প্রাক্-তুর্কীযুগ' ; গ্রন্থকার এ-অধ্যায়ে 'বাংলাদেশ ও মুসলমান', 'বাংলা ভাষা' এবং 'বাংলা-ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন' শীর্ষক সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। 'বাংলাদেশ ও মুসলমান' শীর্ষক পরিচ্ছেদে তিনি বাংলাদেশের পরিচিতি, 'বাংলা' নামের উৎপত্তির ইতিহাস, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এবং 'বঙ্গ'-নামে বাংলার বিভিন্ন জনপদকে একীভূত করায় মুসলমানদের অবদান বর্ণনা করেছেন। শেষোক্ত প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের বক্তব্য উদ্ধৃত হল :

বাংলা অতি প্রাচীন দেশ। ঋগ্বেদের (আনুমানিক কাল খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর) শাখা 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে 'বঙ্গ' নামে এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গভূমি 'বঙ্গ', 'পুণ্ড্র', 'গৌড়', 'রাঢ়', 'সুহ্ম', 'ব্রহ্ম', 'তাম্রলিপ্ত', 'সমতট', প্রভৃতি জনপদ বিভক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক এই জনপদগুলিকে 'গৌড়' নামে একতাবদ্ধ করিবার প্রয়াস দেখা যায়। শশাঙ্কের পর হইতে 'পুণ্ড্র', 'গৌড়' ও 'বঙ্গ'—এই তিন জনপদ যেন বাংলাদেশের সমার্থক হইয়া উঠে। 'বঙ্গ' নামে বাংলার বিভিন্ন জনপদকে একতাবদ্ধ করিয়া তুলিবার কাজ হিন্দু আমলে যে সাধিত হয় নাই, ইহা একরূপ সর্বস্বীকৃত মত। এই কাজ সাধিত হইয়াছিল মুসলমান আমলে।

বঙ্গে তুর্কী শাসন-কালে ইহার সূত্রপাত হয় এবং মুঘল-আমলে আকবরের শাসন-কালে ইহার পূর্ণ পরিণতি ঘটে। সম্রাট আকবরের সময়েই সমগ্র বঙ্গদেশ "সুবহ্-ই-বঙ্গালহ্" নামে পরিচিত হয়। ইংরেজ আমলে আসিয়া ইহার আয়তন (বিহার ও উড়িষ্যাসহ) কতকটা খর্বীকৃত হইয়া বাংলা-দেশ সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। অতএব, যে 'বাংলাদেশ' বলিতে আমরা নিজেদের দেশ বলিয়া মনে করি, তাহার স্রষ্টার কৃতিত্ব মুসলমানদেরই প্রাপ্য।[২৩]

আমাদের বিভাজিত এই কালপরিসরে সম্পন্ন সাহিত্যগবেষণা প্রথমতঃ ইতিহাসমূলক; দ্বিতীয়তঃ, আবিষ্কার, সংগ্রহ এবং সম্পাদনা-নির্ভর। এ-সময়কালে রচিত আমাদের আলোচিত তিনটি গ্রন্থই বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়াস। এ-তিনটি গ্রন্থের একটি বিশ্লেষণ করেছে প্রাচীন যুগের বাংলাসাহিত্য এবং অপর দু'টি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করেছে মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলাসাহিত্যে মুসলিম অবদান।

দুই. ১৯৫৮-১৯৭১

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৭ই অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মার্চ, এই সময়-কাল পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলার 'আইয়ুবী দশক'-নামে পরিচিত। উপর্যুক্ত কালপরিধি পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলার বাঙালির রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গতিধারা করেছে চিহ্নিত। এ-সময়ের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাক্রমগুলি হচ্ছে 'শিক্ষাকমিশন রিপোর্ট'-প্রশ্নে শক্তিশালী ছাত্র-আন্দোলন এবং সে-আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জুন সামরিক শাসন প্রত্যাহার, ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের পাক-ভারত যুদ্ধ এবং নির্বাচনের ছত্রছায়ায় সামরিক-শাসকের গণতান্ত্রিক আবরণ পরিধান, ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তির ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' দাবী, '৬৭, '৬৮, '৬৯-এর প্রচণ্ড ছাত্র-গণ-আন্দোলন এবং শাসকের হাতবদলের মাধ্যমে পুনরায় সামরিক-শাসন প্রবর্তন। অতঃপর স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে পাকিস্তান-শাসিত পূর্ব-বাংলার বাঙালির ঊর্মিমুখর গণঅভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়ায় সামরিক-শাসন প্রত্যাহার এবং ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বাঙালি জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক শক্তির সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মার্চ শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের নগ্ন আত্মপ্রকাশ, ২৬শে মার্চ গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) স্বাধীনতা ঘোষণা, পরবর্তী নয়মাসের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ-এর অভ্যুদয়, এই হল পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলার বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা।

এই তেরো বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলার ঐ-কালের সাহিত্যগবেষণার প্রবাহ ও প্রবণতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলার তিনটি রাজনৈতিক-স্রোতের কথা। 'আইয়ুবী-দশকে' প্রগতিশীল রাজনৈতিক-স্রোত আদর্শ-বাস্তবায়ন ও সংগ্রামের প্রশ্নে ততটা সক্রিয় নয়। সাহিত্যগবেষণার ক্ষেত্রেও, যাঁরা মতাদর্শে প্রতিশ্রুতিশীল, তাঁরা কেউ পরিচর্যা করেছেন শাসকগোষ্ঠীর নীতি, কেউ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক পদ, কারুর সাহিত্যগবেষণায় প্রতিফলিত হয়েছে স্বাজাত্যানুরাগ, অন্ধ-ঐতিহ্যপ্রীতি এবং সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি, কেউবা প্রগতিশীলতার আবরণ ত্যাগ ক'রে গ্রহণ করেছেন শাসক-পরিপুষ্ট 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' পূর্বাঞ্চল শাখার সদস্যপদ। ফলে এ-সময়ের সাহিত্যগবেষণা প্রধানতঃ আদর্শের প্রশ্নে প্রতিশ্রুতিশীল সাহিত্যগবেষকের নীতিস্খলনে এবং অখণ্ড-পাকিস্তান প্রশ্নে বিতর্ক-বিমুখ সাহিত্যগবেষকের বাংলাসাহিত্যে 'মুসলিম অবদান' নির্ণয়ে মুখর। এ-সময়ে উদার মানবতাবাদী সাহিত্যগবেষকের সুদৃঢ় অবস্থান বিরল। বস্তুতঃ, ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে 'রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী'-কে কেন্দ্র ক'রে যে সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলায় ঘনীভূত হয়েছিল, তা এ-দেশের সাহিত্যগবেষণায় পালন করেছে দূরসঞ্চারী ভূমিকা।

তবু, উল্লিখিত তেরো বছরই এদেশের সাহিত্যগবেষণার যথার্থ বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার কালরূপে চিহ্নিত। পূর্বে উপস্থাপিত হয়েছে ব্রিটিশশাসিত ও পাকিস্তান-অন্তর্গত পূর্ব-বাংলায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার একটি খণ্ড-চিত্র। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়-ভিত্তিক ঐ পরিসংখ্যান এ-দেশের সাহিত্যগবেষণার প্রবণতা অনুসন্ধান-ক্ষেত্রে তাৎপর্যবহ। কেননা, দু'টি ব্যতিক্রম ব্যতীত[২৪] বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্তরাই প্রধানতঃ এই তেরো বছরের সাহিত্যগবেষণা-ইতি-হাসের নির্মাতা। কিন্তু এই সাহিত্যগবেষণার ইতিহাস গৌরবজনক কোন অধ্যায়ের সূচনা করেনি। এ-সময়সীমায় ছত্রিশটির মত প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থের মধ্যে আন্তর্জাতিক-মানসম্পন্ন গ্রন্থের সংখ্যা আশাব্যঞ্জক নয়।[২৫] পাকিস্তান-অন্তর্গত পূর্ব-বাংলায় উচ্চতর পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষার প্রসার ঘটলেও, সাহিত্যগবেষণার ক্ষেত্রে তার যথার্থ প্রতিফলন দুর্লক্ষ্য। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালপরিধিতে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বাংলাসাহিত্য বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেছেন দেড় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী, অথচ বিচ্ছিন্নভাবে গবেষণা-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ছাড়া সাহিত্যবিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে মাত্র ছত্রিশটি। গবেষণাকর্মে অনাগ্রহ এবং ডিগ্রিলাভের আগ্রহের এ-প্রবণতার প্রধান কারণ, পথ-বিচ্যুত হয়ে অন্যমনস্ক শিক্ষার্থীর বাংলাসাহিত্য অধ্যয়নে অনুপ্রবেশ, সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক অস্থিরতাজাত বেকারসমস্যা, চাকুরির মোহ, পরিশ্রমবিমুখতা ও অধ্যবসায়ের অভাব, গড়-মেধার অপর্যাপ্ততা এবং সহজ উপায়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে ডিগ্রিলাভের আকাঙ্ক্ষা। ফলতঃ, তেরো বছরের এই সাহিত্যগবেষণা জন্ম দিয়েছে অল্প-সাফল্য, অধিক-ব্যর্থতা। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের গবেষণাবিষয় এবং গবেষকের প্রবণতার মধ্যেই এই সাফল্য-ব্যর্থতার রহস্য নিহিত।

উপর্যুক্ত তেরো বছরে প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থের এক তৃতীয়াংশই সাহিত্যের ইতিহাস এবং ইতিহাসমূলক গ্রন্থ রচনার প্রয়াস। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ধারা একশ বছর পূর্বেই ব্রিটিশ-উপনিবেশের রাজধানী কলকাতায় সূচিত হয়েছিল। কিন্তু সে-ইতিহাসের রচয়িতা ছিলেন বাঙালী হিন্দু; ফলতঃ তাঁদের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলাসাহিত্যে 'হিন্দু'র অবদান ও মাহাত্ম্য। পক্ষান্তরে উপেক্ষিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে বাঙালি-মুসলমানের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা। তাঁদের রচনায় বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সাধনায় নির্মিত হয়েছে যে বিশাল বাংলাসাহিত্য, তা হয়েছে দ্বিখণ্ডিত; ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালি জাতিসত্তায় বিভেদারোপ ক'রে শ্রেণীকরণকৃত সাহিত্যের

শিরোনামা হয়েছে 'ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য'[২৬]। কিন্তু ঐতিহাসিক-সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম ঐতিহ্যানুরাগ দেশকাল-রাজনীতির সমর্থনপুষ্ট হ'য়ে এদেশের সাহিত্যগবেষণায়ও প্রতিফলিত হয়। কলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালি-হিন্দু ঐতিহাসিকের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণের প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন আলোচ্যকালে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের শিরোনামায় এবং এর অন্তর্গত বিষয়বিন্যাসে লক্ষণীয়। আনিসুজ্জামান নির্ণীত এ-ধারার গবেষকদের প্রবণতা এবং তার কারণ, বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত হল :

> বাঙালী মুসলমানের হাতে আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে যে ফসলটুকু ফলেছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের দ্বারা সাধারণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। পাকিস্তান-সৃষ্টির পর সেকালের মুসলিম সাহিত্যব্রতীদের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল জেগেছে, অনেক উৎসাহী কর্মী তাঁদের জীবন-কাহিনীর পুনর্গঠনে এবং তাঁদের রচনার সন্ধান ও সংগ্রহে, পরিচয়দান ও মূল্য-নিরূপণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এর মূল্য আছে। কিন্তু একথাও সত্য যে, অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি ও সাধারণ আবেগ যে পরিমাণ প্রসারিত হয়েছে, সে পরিমাণে জিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ বিকশিত হয়নি। সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে অজ্ঞতা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে এবং শ্রদ্ধাবোধ সাহিত্যবিচারকে বিচলিত করেছে।[২৭]

এছাড়াও এ-পর্যায়ের গ্রন্থসমূহে সাহিত্যগবেষকরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেশকাল-ধর্ম-নিরপেক্ষ শাশ্বত কবিধর্ম-কে করেছেন বিভাজন ; কবিরা 'মুসলিম কবি' এবং 'হিন্দুকবি' অভিধা পে'য়ে স্থান পেয়েছেন সম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধ পরিসরে। লক্ষণীয়, ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলায় যখন ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদকে উপলক্ষ্য ক'রে সংগঠিত হচ্ছে আন্দোলন তখন এদেশের সাহিত্যগবেষকরা কবিদের সাম্প্রদায়িক অভিধা দিয়ে তাঁদের ধ্রুপদ জাতিসত্তায় আরোপ করেছেন বিভেদ। এতদ্ব্যতীত কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যগবেষক ও ঐতিহাসিকদের অনুসরণ ও অনুকরণে এদেশের কয়কজন গবেষক তাঁদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রের গবেষণায় অনুসন্ধান করেছেন 'জাতীয় কবি'[২৮] ও 'জাতীয় মহাকাব্য'[২৯], ফলে বিশেষ চেতনাতাড়িত এসব গবেষণাকর্মে উদ্ঘাটিত হয়েছে একাধিক জাতীয় কবি ও মহাকাব্য। বলাবাহুল্য, উপর্যুক্ত প্রবণতা সব গ্রন্থ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। উপেক্ষিত ঐতিহ্যের উদ্ধার ও তার নবমূল্যায়নে এবং বাংলাসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পরিপূরক হিসেবে এ-ধারার গ্রন্থসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলার তেইশ বছরের সাহিত্যগবেষণা প্রধানতঃই ইতিহাসমূলক ; উল্লেখযোগ্য, এর অধিকাংশই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'মুসলিম-কবি'র অবদানের ইতিহাস। এ ছাড়াও ঐ-কালপরিসরে সম্পন্ন হয়েছে মধ্যযুগে রচিত কাব্য-পুথির সম্পাদনা ; যা বাংলাসাহিত্যের ও বাঙালির সামাজিক ইতিহাস রচনায় হবে সহায়ক। মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস রচনা ক'রতে গিয়ে গবেষকরা বাধার সম্মুখীন হয়েছেন কবির সময়কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে। কাব্য—ব্যক্তি, সমাজ ও সময়ের অনিবার্য প্রতিচিত্র ; কবির সময়কাল নির্ণয়কে তাই গবেষকরা প্রধান দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে সময়কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে ব্যয়িত হয়েছে গবেষকদের মূল্যবান সময়।

গবেষণার মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা কিছু অপরিণত সাহিত্যগবেষকের জন্ম দিয়েছে এ-দেশে। উল্লেখযোগ্য প্রতিভান-শক্তির যখন ঘটে অভাব তখনই আক্রমণাত্মক প্রবণতার ঘটে বাহুল্য। গ্রন্থভিত্তিক আলোচনায় আমরা এ-প্রবণতার প্রমাণ প্রত্যক্ষ

করব। এ-দেশের সাহিত্যগবেষণা প্রধানতঃই জ্ঞানপীঠ-ভিত্তিক (Academic) ; প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্য ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে সম্পন্ন গবেষণাগ্রন্থের সংখ্যা অল্প। এবং এ-সব গ্রন্থের প্রকাশকও মুখ্যতঃ সরকারী-আধাসরকারী-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এ-পর্যায়ের গ্রন্থের মূল্যনিরূপণে আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৪৪) নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

> বাংলা সাহিত্য ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের গবেষণায় বাঙলা ভাষার ব্যবহার নিতান্তই সামান্য। তবু পত্র-পত্রিকায় ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত এই কালের গবেষণা কর্মের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এগুলোর অধিকাংশই একাডেমিক ন্যাচারের গবেষণা, এগুলোতে আমাদের দেশের অধঃপতিত শিক্ষাব্যবস্থার ছাপ যতটা স্পষ্ট লেখকদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ততটা স্পষ্ট নয়। আর হিন্দুবিদ্বেষ, ভারত-বিদ্বেষ, মুসলিম সাম্প্রদায়িক চেতনা ও পাকিস্তানবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গি এসব গবেষণাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। তা-ছাড়া অধিকাংশ গবেষণাতেই লক্ষ্য করা যায় শুধু চর্বিতের চর্বণ। অকারণে পাদটীকা সংযোজন করে প্রবন্ধের দর্শকদের, অর্থাৎ যাঁরা পড়েন না শুধু পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখেন তাঁদের, চোখে চমক লাগিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা আছে অনেকের। যে-ক্ষেত্রে পাদটীকা দরকার সেখানে পাদটীকা না-দেওয়ার এবং পাদটীকাকে পর্যাপ্ত না করার প্রবণতাও প্রচুর। এ-সত্ত্বেও কয়েকজন গবেষক শ্রম ও আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্ন যুগের বাঙালির ও বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের নানা বিষয় উদঘাটন করে বাঙালির জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন জ্ঞান সংযোজন করেছেন।[৩১]

অভিন্ন-কালসীমায় আমরা প্রত্যক্ষ করি সামন্তবাদী, উদার বুর্জোয়া মানবতাবাদী এবং বাস্তববাদী সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্যগবেষণা। এর অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ গবেষণারই প্রতিপাদ্য, হয় ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব, না হয় নন্দনতত্ত্ব। সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্যগবেষণা আবার প্রায়শঃ উদ্দেশ্য-তাড়িত। এছাড়া ক্বচিৎ প্রত্যক্ষ হয় সমাজতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের সংশ্লেষাত্মক সাহিত্যগবেষণা। তবে এই চব্বিশ বছরের সাহিত্যগবেষণার ধারা পর্যবেক্ষণ ক'রলে দেখা যায় সাধু-ভাষাশ্রয়ী ব্যাখ্যামূলক বিবরণধর্মিতা ক্রমশঃ অপসৃত হ'য়ে প্রাধান্য অর্জন করেছে চলিত-ভাষাশ্রয়ী মূল্যায়নপ্রবণ সাহিত্যগবেষণা।

আলোচ্য কালপরিধিতে প্রকাশিত বিবরণ ও বিশ্লেষণপ্রবণ গবেষণাগ্রন্থের সংখ্যা ছত্রিশ।[৩২] প্রবণতা-নির্দেশের এবং আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ঐ-সময়কালে রচিত গ্রন্থসমূহের নিম্নরূপ শ্রেণীকরণ করেছি : [ক] ইতিহাসমূলক গবেষণা—এ-পর্যায়ের গ্রন্থ-গুলি হচ্ছে নীলিমা ইব্রাহিমের (১৯২১) 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক' (উপস্থাপনকাল ১৯৫৯, প্রকাশকাল ১৯৬৪), মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' (প্রথম খণ্ড ১৯৬০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬৪), কাজী আবদুল মান্নানের (১৯২৮) 'আধুনিক বাংলাসাহিত্যে মুসলিম-সাধনা' (১৯৬১), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের (১৯৩৯) 'আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র' (১৯৬২) এবং 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' (উপস্থাপনকাল ১৯৬৯, প্রকাশকাল ১৯৭০), আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (উপস্থাপনকাল ১৯৬২, প্রকাশকাল ১৯৬৪) এবং 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র' (১৯৬৯), গোলাম সাকলায়েনের (১৯২৮) 'বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য' (উপস্থাপনকাল ১৯৬২, প্রকাশকাল ১৯৬৪), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৭১), আবুল হাসানাতের (১৯৩৬) 'মুসলিম রচিত উপন্যাস' (১৯৭০) এবং মুহম্মদ মজির উদ্দীনের 'বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা' (১৯৭০)। [খ] সাহিত্যগবেষণা : মধ্য-যুগ—এ-শ্রেণীর গ্রন্থগুলি হল মযহারুল ইসলামের (১৯২৫) 'কবি হেয়াত মামুদ' (১৯৬১),

গোলাম সাকলায়েনের 'ফকীর গরীবুল্লাহ্' (১৯৬১), আহমদ শরীফের 'সৈয়দ সুলতান—তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ' (উপস্থাপনকাল ১৯৬৭, প্রকাশকাল ১৯৭২), সৈয়দ আলী আহসানের 'পদ্মাবতী' (১৯৬৮), ওয়াকিল আহমদের (১৯৪১) 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' (১৯৭০) এবং মমতাজুর রহমান তরফদারের 'বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি' (১৯৭১)। [গ] লোকসাহিত্য-গবেষণা—এ-ধারার গ্রন্থগুলি হচ্ছে আশরাফ সিদ্দিকীর (১৯২৭) 'লোকসাহিত্য' (১৯৬৩), আনোয়ারুল করিমের (১৯৩৭) 'বাউল কবি লালন শাহ্' (১৯৩৬) এবং 'বাউল সাহিত্য ও বাউল গান' (১৯৭১), মযহারুল ইসলামের 'ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন' (১৯৬৭) এবং 'লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস' (১৯৬৯), মুহম্মদ আবদুল হাফিজের (১৯২৯) 'লোককাহিনীর দিক-দিগন্ত' (১৯৬৮) এবং মুহম্মদ আবু তালিবের 'লালন শাহ্ ও লালন-গীতিকা' (প্রথম খণ্ড ১৯৬৮)। [ঘ] গবেষণামূলক প্রবন্ধসঙ্কলন—এ-পর্যায়ের গ্রন্থগুলি হল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৫), গোলাম সাকলায়েনের 'মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক' (১৯৬৭) এবং মুস্তাফা নূরউল ইসলামের (১৯২৭) 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৮)। [ঙ] আধুনিক-সাহিত্য গবেষণা—বর্তমান শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে আনোয়ার পাশার (১৯২৮-১৯৭১) 'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা' (প্রথম খণ্ড ১৩৭০; দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৮) এবং 'সাহিত্য শিল্পী আবুল ফজল' (১৯৬৭), মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫-১৯৭১) 'মীর-মানস' (১৯৬৫) এবং 'তুলনামূলক সমালোচনা' (১৯৬৯), আতাউর রহমানের (১৯২৪) 'নজরুল কাব্য-সমীক্ষা' (১৯৬৭), সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৯২৭) 'জসীমউদ্‌দীন' (১৯৬৭) এবং 'কবি ফররুখ্ আহমদ' (১৯৬৯), সৈয়দ আকরম হোসেনের (১৯৪৪) 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: দেশকাল ও শিল্পরূপ' (উপস্থাপনকাল ১৯৬৭, প্রকাশকাল ১৯৬৯), আহমদ কবিরের 'রবীন্দ্রকাব্য: উপমা ও প্রতীক' (উপস্থাপনকাল ১৯৬৭, প্রকাশকাল ১৯৭৪), হুমায়ূন আজাদের (১৯৪৭) 'রবীন্দ্রপ্রবন্ধ: রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা' (উপস্থাপনকাল ১৯৬৮, প্রকাশ-কাল ১৯৭৩), মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের (১৯৩২) 'ভাষাশিল্পী মশাররফ' (১৯৬৯), রফিকুল ইসলামের (১৯৩৪) 'নজরুল-নির্দেশিকা' (১৯৬৯), এবং সন্‌জীদা খাতুনের (১৯৩৩) 'সত্যেন্দ্র-কাব্য পরিচয়' (১৯৬৯)।

[ক] ইতিহাসমূলক গবেষণা

নীলিমা ইব্রাহিমের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক' ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও রচনাটি গবেষণা-অভিসন্দর্ভ হিসেবে ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য অনুমোদন লাভ করে।[৩৩] গবেষণা-বিষয় হিসেবে নীলিমা ইব্রাহিম-ই প্রথম নাট্যসাহিত্য তথা আধুনিক বাংলাসাহিত্যকে অন্তর্ভুক্ত করলেন; বস্তুতঃ এর পূর্ব পর্যন্ত এ-অঞ্চলের সাহিত্যগবেষণা ছিল মধ্যযুগ-নির্ভর। বর্তমান গ্রন্থে প্রথমতঃ ব্যাখ্যা করা হয়েছে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, অতঃপর বিশ্লেষণ করা হয়েছে নাটক রচনার সামাজিক পটভূমি এবং নাটকে প্রতিফলিত সমাজচিত্র। গ্রন্থকার উনিশ শতকের বাংলা-নাটকের যে শ্রেণীকরণ করেছেন তা' হল, 'কৌলিন্য প্রথা ও বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় নাটক', 'ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপারে মদ্যপানাসক্তি ও তার প্রতিকার-কল্পে রচিত নাটক', 'জাতীয়তাবাদ প্রচারমূলক নাটক', 'নারীকল্যাণ কামনায় রচিত নাটক', 'ধর্মমূলক নাটক' এবং 'বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে রচিত নাটক'।

এর ভূমিকাংশে নাট্যসাহিত্যে যুগ-প্রভাব বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে উনিশ শতকের কলকাতার নবোদ্ভিন্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামাজিক ইতিহাস প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বাংলা নাটকের উদ্ভবের পটভূমি। বাংলা নাটকের উৎস-সন্ধানে নীলিমা ইব্রাহিমের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হল:

> ···বাংলার আদি নাট্যকারেরা তাঁদের নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্য রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ অর্থাৎ লৌকিক যাত্রাভিনয়ের পালাগুলির নিকট ঋণী। বিশেষ করে যে দুই ধারা ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব বাংলা নাটক রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল, সে উভয় ক্ষেত্রেই সঙ্গীতের অভাব ছিল। কিন্তু বঙ্গের আপামর জনসাধারণ ছিল সঙ্গীত ভক্ত এবং এই কারণেই লৌকিক যাত্রাগানগুলি ছিল সঙ্গীতে মুখর। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি বাঙ্গালীর হৃদয়ের এই সুকুমার বৃত্তির পিপাসা সম্পর্কে হেরেসিম লেবেডফ সচেতন হয়েছিলেন এবং বাংলার নাট্যকারেরাও উদাসীন রইলেন না। মধুসূদনের নাটকে সংগীত সংযোজিত হ'ল অর্থাৎ উপরোক্ত দু'ধারার সঙ্গে একটি তৃতীয় ক্ষীণ স্রোত এসে মিলিত হয়ে বাংলা নাটককে পূর্ণ রূপ দানে সহায়তা করলো। বাংলা নাটকে এই সংগীত সংযোজনা যাত্রার প্রত্যক্ষ ফল।···তাই বাংলা নাটকের আদি রূপ গ্রহণে যাত্রার প্রভাবকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। যদিও মূল উৎস পাশ্চাত্য ভাবধারা ও রচনারীতি তবু দেশীয় রীতিটুকু সম্পূর্ণ দেশজ শিল্পপ্রাণ থেকে গৃহীত।[৩৪]

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' (প্রথম খণ্ড) বাংলাসাহিত্যে মুসলিম-অবদান নির্ণয়ের প্রয়াস। তাঁর আলোচনার পরিধি ১৮৬০ থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ; তবু প্রাচীন কাব্য-নিদর্শন চর্যাপদ থেকে আঠারো শতকের কবি রামপ্রসাদ সেনের কাব্য-সাধনা কালের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তিনি উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন মধ্যযুগের আমীর-ওমরাহ্‌দের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার নিম্নরূপ পরিচয় দিয়েছেন :

> বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে মুসলমান প্রচেষ্টার মূল্য অপরিমেয়। নিজেদের মাতৃভাষায় হিন্দু সংস্কৃতির প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলোর অনুবাদের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিলেন হিন্দু সংস্কৃত পণ্ডিতেরা। পৃথিবীর সভ্য জাতিদের ইতিহাসে ইহা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিবার ইহা একটা আশ্চর্য অপকৌশল।···
>
> সুতরাং বাংলার এই নিতান্ত সঙ্কটকালে মুসলমান আমীর ও ওমরাহ্‌দের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য আপ্রাণ ও সক্রিয় প্রচেষ্টা গৌরবজনক। ইহাকে কাকতালীয়বৎ বিবেচনা করা মূঢ়তা।···ইরানের ভাষা ও সাহিত্যের জন্য ইসলাম যাহা করিয়াছে তাহা বিস্ময়কর এবং ঠিক বঙ্গভাষারই অনুরূপ। জ্ঞানের পথকে রুদ্ধ করিবার সাধনা ইসলাম ধর্মের বহির্ভূত।[৩৫]

অতঃপর তিনি লিখেছেন : "সুদীর্ঘ কাল বিদেশী ও বিজয়ী মুসলমানবর্গ এদেশে বসবাস করার ফলে তাঁহাদের মাতৃভাষার পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই হইয়াছিল। ফার্সী হইতে উর্দ্দু এবং উর্দ্দু হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাংলায়। মুসলমানদের সাধনা সৃষ্টিধর্মী সাধনা। বাংলাদেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধনই মুসলমান বাদশাহ এবং আমীর ওমরাহ্‌দের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল।"[৩৬] এই বক্তব্যের সমর্থনে গ্রন্থকার "গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্ত্তনায় হিন্দু শাস্ত্র-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হইল"—দীনেশচন্দ্র সেন-এর এ-মন্তব্য সংযুক্ত ক'রে মধ্যযুগের শাসকবর্গকে সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কবি আলাওল-সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে ঐতিহাসিকের সহনশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। এছাড়া আলাওল-প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্যও তর্কসাপেক্ষ : "তাঁহার সম্পূর্ণ নাম আলাওল হক বলিয়া মনে হয়। তিনি যে মগের মুলুক আরাকান

ও চট্টগ্রামে ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আলাওলের জীবনেতিহাস আদৌ জানিতে পারা যায়না।"[৩৭] আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রবন্ধ-সাহিত্যে বাঙালি-মুসলমানদের অবদান-ব্যাখ্যা এর ধারাবাহিকতাকে করেছে ব্যাহত। বিবরণমূলক এ-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় অনুমান-নির্ভর মন্তব্য, তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে লক্ষ্য করি সিদ্ধান্ত প্রদানের বাহুল্য।

কাজী আবদুল মান্নানের 'আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা' এদেশের সাহিত্যে বাঙালি-মুসলমানদের অবদানভিত্তিক প্রথম পূর্নাঙ্গ গ্রন্থ। ইতোপূর্বে মুহম্মদ এনামুল হক রচিত 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য'-গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে "ইংরেজ আমলে মুসলিম বাংলা সাহিত্য" শিরোনামায় এ-সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থ-প্রণয়নের অনুপ্রেরণা প্রসঙ্গে কাজী আবদুল মান্নানের ভাষ্য লক্ষণীয়: "বাঙলা-সাহিত্যের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করতে গিয়ে যে-প্রশ্নটি বারবার মনে জেগেছে তা' হচ্ছে—আধুনিক কালে পাশ্চাত্য শাসন, শোষণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালী হিন্দুর বিচিত্র মানসিক বিকাশ ঘটেছে; বাঙলা সাহিত্য অপরূপ শোভা এবং সমৃদ্ধি লাভ করেছে; কিন্তু এতে বাঙালী মুসলমানের ভূমিকা কতটুকু? প্রায় বার বছর ধরে এ-প্রশ্নের সীমাংসা খুঁজে আসছি। মুসকিল হচ্ছে, একালের মুসলমান লেখকদের সাহিত্যিক প্রয়াস কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা সংরক্ষিত না হওয়ায়, এখন তা' বিক্ষিপ্ত ও দুর্লভ। দীর্ঘকাল ধরে আমি নানাভাবে সেগুলো সংগ্রহ ক'রে, তাঁদের প্রয়াসের একটা সূত্র বের করার চেষ্টা করেছি। বর্তমান পুস্তক সে-চেষ্টারই প্রথম ফল। কেমন হ'ল জানিনা; তবে, আমার এ-প্রচেষ্টা আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের যথার্থ মূল্যায়নে কিছুটা সহায়ক হতে পারে, এটাই আমার একমাত্র ভরসা।"[৩৮] এ-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে মুসলিম-সাধনার পটভূমি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ব্রিটিশশাসিত বাংলায় শাসিত মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া এবং সাহিত্যরচনায় সে-সমাজের ভূমিকা হয়েছে বিশ্লেষিত। কোন্ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পটভূমি তাঁদের সাহিত্যসাধনার পরিবেশ প্রণয়ন করেছিল, তার বিশ্লেষণে গ্রন্থকার প্রয়োগ করেছেন ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে তাঁদের বিক্ষিপ্ত সাহিত্যিক প্রয়াস—বিশেষতঃ গদ্যরচনার ক্ষেত্রে আধুনিক অভিনব জীবনবোধের অভিব্যক্তি এবং বিশ্লেষিত হয়েছে নক্সা, প্রহসন, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায় তাঁদের ভূমিকা। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে আলোচিত হয়েছে মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ সাহিত্যিক প্রয়াস তথা সমাজসংস্কার-আন্দোলন, সাময়িকপত্র প্রকাশনার গুরুত্ব এবং জাতীয় আখ্যানকাব্যের ধারায় তাঁদের কবিপ্রেরণার উৎস ও অবস্থান। বাঙালি মুসলমানদের কাব্য-প্রেরণার উৎস ও অবদান-প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের মূল্যায়ন অনুধাবনীয়:

> হিন্দু কবিরাও তাঁদের কাব্য 'পক্ষপাতিত্বের ঘৃণনীয় কলঙ্ক-কালিমা' থেকে মুক্ত রাখতে পারতেন। ···আমরা সবাই জানি, একালে হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে শাসকের সংঘর্ষ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং উনিশ শতকের গোড়া থেকে ইংরেজ হিন্দুর ক্ষেত্রে যা করেছিল, বিশ শতকে মুসলমানের ক্ষেত্রে তারই পুনরাবৃত্তি করে। কিন্তু, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, শাসকের ভেদনীতিকে সার্থক করার জন্য মুসলমান সাহিত্যিকগণ লেখনী ধারণ করেন নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বাণী তাঁরা শুনিয়েছেন তার মধ্যে দ্বিধা নেই বা পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নেই। কবির কণ্ঠ কোথাও বিদ্বেষের দ্বারা বিষাক্ত, লোভের দ্বারা কম্পিত বা ভয়ের দ্বারা কুণ্ঠিত নয়; সে কণ্ঠ উদার, প্রদীপ্ত এবং নির্ভীক। [৩৯]

আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' মুসলিমমানস বীক্ষায় এবং তার অবদান বিশ্লেষণে এদেশের সাহিত্যগবেষণায় বিশিষ্ট সংযোজন। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হ'লেও, গ্রন্থটি ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে পিএইচ. ডি. গবেষণা-অভিসন্দর্ভ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। গ্রন্থটি দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত ; প্রথম পর্যায়ে বিবেচিত হয়েছে বাংলা সাহিত্য সাধনায় মুসলিম মানস-গঠনের পটভূমি হিসেবে সমকালীন দেশকাল তথা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত। 'দেশ ও কাল' শিরোনামাধীন এ-আলোচনা ভবিষ্যৎ-গবেষকদের উপাদান সংগ্রহে সহায়ক হবে। গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'সাহিত্য ও চিন্তাধারা' শিরোনামায় বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে ১৭৫৭ থেকে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যভিত্তিক মানসরূপ। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ-অবলম্বিত এ-গ্রন্থে সাহিত্যসাধনায় বাঙালি-মুসলমানদের ভূমিকা প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামানের নিম্নরূপ বিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ :

> হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনা এবং পরাধীনতার জন্যে গ্লানিবোধ অনেক লেখকের রচনায় খুব স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এই পঞ্চাশ বছরের মুসলিম-সৃষ্ট রচনাবলী সামগ্রিকভাবে বিচার করলে বলতে হবে যে, এই মনোভাব শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে। তার একটা কারণ এই যে, যে সময়ে বাঙালী মুসলমান লেখকরা সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, সেটা হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের যুগ। হিন্দু ঐতিহ্যগর্বের একটা ফল দেখা দিয়েছিল মুসলিম-বিদ্বেষী মনোভাবের উদ্বোধনে। তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া জেগেছিল মুসলমান সমাজে। হিন্দু লেখকদের রচনায় ঐতিহাসিক পটভূমিতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-স্মৃতির চর্চা করা হয়েছিল ; মুসলমান লেখকরাও তার জবাব দিয়েছিলেন। সম্পর্কের তিক্ততা এতে বৃদ্ধি পায়। তার উপরে, একালে বাঙালী মুসলমান নানারকম উন্নতিলাভের আশা করেছেন। এ ক্ষেত্রে হিন্দুকে তাঁরা মনে করেছেন প্রতিদ্বন্দ্বী, হিন্দুও তার সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় উৎসাহিত বোধ করেন নি।
>
> সুতরাং বাঙালী মুসলমান লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হল তাঁর সমাজ ও সম্প্রদায় সম্পর্কে অনুভূতি। এক্ষেত্রে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মুসলমান লেখকের ভূমিকা স্মরণযোগ্য। আমাদের সমাজে আধুনিক শিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে যোগস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে, তাঁদের প্রচেষ্টা সমাজের অগ্রগতির সহায়ক হয়েছিল। মাতৃভাষা সম্পর্কে ক্রমেই তাঁরা যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন, তাও স্মরণীয়।[৪০]

আনিসুজ্জামানের রচনারীতি আবেগবর্জিত, তিনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন সাহিত্য-তাত্ত্বিক মূল্যায়নের পরিবর্তে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' এ-দেশে সমাজতত্ত্ব-নির্ভর সাহিত্যালোচনায় পথিকৃতের অংশীদার। কবি কায়কোবাদের (১৮৫৮-১৯৫২) কবি-মানস বিশ্লেষণে তাঁর স্বতন্ত্র বর্ণনারীতি ও কাব্যমূল্যায়ন-ভঙ্গি লক্ষণীয় : '''' কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' ভারতীয় মুসলিম শক্তির বীর্যবত্তার এমন বিবরণ হতে পারেনি, যা থেকে কবির সমসাময়িক কালের মুসলমানেরা প্রেরণা পেতে পারতেন। এই কাব্যে আমরা দেখতে পাই দুটি বীর গোষ্ঠী আদিম জিঘাংসা নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এর পশ্চাতে নিয়তির লীলাই একমাত্র লক্ষণীয় মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-ভিত্তিক রোমান্সগুলি বা রমেশ দত্তের উপন্যাস হিন্দু ঐতিহ্য সম্পর্কে বাঙালী হিন্দু পাঠকের মনে যে সচেতনতা এনে দিয়েছে, কোন সম্প্রদায়ের বাঙালী পাঠকের জন্যেই কায়কোবাদ তা করতে পারেন নি। হালীর তুলনায়ও কায়কোবাদের ব্যর্থতা এখানে। তাঁর ইতিহাসচেতনা সৃষ্টিধর্মী ছিল না।''[৪১]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র' শীর্ষক গ্রন্থের উপজীব্য আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবনচিত্র অনুসন্ধান এবং হিন্দু কবি-দের রচনায় বিধৃত মুসলিম-প্রসঙ্গের স্বরূপ উন্মোচন। বর্তমান-গ্রন্থে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)), দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), দুর্গাচরণ সান্যাল (১৮৪৭-?), ধীরেন্দ্রনাথ পাল, প্রসন্নকুমার নাগ, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং যোগীন্দ্রনাথ বসুর (১৮৫৭-১৯২৭) কাহিনীকাব্যসমূহ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে গ্রন্থকারের ভাষ্য :

> মুসলিম চরিত্র ও চিত্রের ঐতিহাসিকত্ব বিচার ক'রে এবং কবির মনোভঙ্গি ও যুগপ্রভাব বিশ্লেষণ ক'রে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত কবিদের কাব্যের পুনর্বিচার এই রচনার উদ্দেশ্য। এই সুদীর্ঘ আলোচনায় আলোচিত কবিদের রচনার প্রেরণা ও বৈশিষ্ট্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা হয়েছে। ইতিহাস-নির্ভর কাব্যগুলোতে কবির ইতিহাস নিষ্ঠা, সত্যচ্যুতি অথবা কাল্পনিক কথকতার যথাসম্ভব প্রাথমিক উৎস নির্দেশ করে কবির মনোভঙ্গি, যুগানুগত্য ও প্রতিভার শক্তিমত্তা প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, সামাজিক সম্পর্কের এই নব-মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্লিখিত হবার প্রয়োজনীয়তা আছে।[৪২]

আলোচ্য-গ্রন্থে গবেষকের অনুসন্ধিৎসা, জিজ্ঞাসা এবং সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ-প্রচেষ্টা স্পষ্ট। তাঁর বিশ্লেষণে কাহিনীকাব্যকার হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চিহ্নিত হয়েছেন এভাবে : "হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) সুস্পষ্ট মুসলিম বিদ্বেষে চিহ্নিত। মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বিতীয় স্তর—সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ও গোত্রপ্রীতির তিনি পুরোধা। ***হিন্দু-গৌরব প্রতিষ্ঠার বাসনায় ইংরেজ তোষণ ও মুসলমানকে হীনবর্ণে ও প্রতিপক্ষরূপে চিত্রিত করার রঙ্গলালীয় পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এবং এক্ষেত্রে, আবেগমুগ্ধ-তাকে মুখ্য জেনে, প্রতিপাদ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে, তিনি ইতিহাস বা ইতিহাস-নাশীয় কোন প্রচলিত বা পূর্বরচিত রচনাকে নির্ভর না করে, স্বয়ং ঐতিহাসিক আবরণে কাল্প-নিক কাহিনীকাব্য রচনা করেছেন।"[৪৩] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের এ-গ্রন্থে সুচারুভাবে নির্দেশিত হয়েছে তথ্যের উৎস, বক্তব্যের সমর্থনে বিন্যাস করা হয়েছে যুক্তি, এবং এই যুক্তিকে বিশ্বস্ত ক'রে তুলতে সংযোজিত হয়েছে প্রমাণ। তাঁর এ-গ্রন্থ আধুনিক কাহিনী-কাব্যে বিধৃত মুসলিম প্রসঙ্গের নবমূল্যায়নে তাৎপর্যমণ্ডিত।

গোলাম সাকলায়েন-রচিত 'বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য' ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য অনুমোদন লাভ করে ; গ্রন্থাকারে এর প্রকাশ ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে। গোলাম সাকলায়েন বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের এ-ইতিহাসগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে-ছেন কারবালা যুদ্ধ-সম্পর্কিত বাংলা পুথি ও কাব্য এবং "রচনার পশ্চাৎপটে আরবী-ফারসী-উরদু মর্সীয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পাক-ভারত ও বঙ্গে শীয়া দরবেশ ও শাসকদের ধর্মপ্রচার তৎপরতা ও মুহর্রমের ঐতিহাসিক তথ্যাদি সম্পর্কে" সংযোজন করেছেন ব্যাখ্যা। প্রসঙ্গতঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-প্রদত্ত 'পরিচিতি'র কিয়দংশ উদ্ধৃত হল : "ডক্টর গোলাম সাকলায়েন 'বাংলার মর্সীয়া সাহিত্য' লিখিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি শূন্যস্থান পরিপূর্ণ করিলেন। ***তিনি গ্রন্থের পরিশিষ্টে সচিত্র মহর্রমের অনুষ্ঠানের বৃত্তান্ত দিয়াছেন, এবং ইংরেজ আমলের মর্সীয়া কাব্যে ব্যবহৃত আরবী, ফারসী, হিন্দীও উর্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ, বার ইমামের তালিকা, গলাত সম্প্রদায়ভুক্ত শীয়াগণের বিভিন্ন উপদল এবং তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের বর্ণনা, এবং ইসলাম ধর্মীয় কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থপঞ্জী ও নামসূচী সংযুক্ত হইয়াছে।"[৪৪]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-রচিত সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড 'বাংলা সাহিত্যের কথা'য় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস। রচনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার-প্রদত্ত কিছু তথ্য 'মুখবন্ধ' অংশ থেকে উদ্ধৃত হল :

> কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের উপদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করে। তাহাতে আমার অংশ ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য। রচনা বাংলা ভাষাতেই হয়। তাহার উর্দু অনুবাদ করেন মৌলভী আবদুর রহমান খেযুদ। ইহা উর্দু আকারে "বাংলা আদব কী তারীখ" নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫৭ সালের জুনে প্রকাশিত হয়। উর্দু ভাষীদের জন্য মূল পুস্তক রচিত হয়। সে জন্য তাহাদের উপযোগী প্রধান প্রধান বিষয় ইহাতে লিখিত হয়। তাহা বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য যথেষ্ট ছিল না, বিশেষতঃ যখন বাংলা ভাষায় অনেকগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। পরে আমার "বাংলা সাহিত্যের কথা"র প্রাচীন যুগের অংশ বিস্তৃত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন মধ্যযুগের অংশ প্রকাশিত হইল। ইহাতে আমি বিশেষ করিয়া মধ্যযুগের সাহিত্যে মুসলমান কৃতিত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়াছি।[৪৫]

মহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র এ-গ্রন্থের সর্বাধিক গুরুত্ববহ সংযোজন সাহিত্যের ইতিহাসের বহু বিতর্কময় 'চণ্ডীদাস সমস্যা'-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার-প্রদত্ত সমাধান। এই প্রমাণ-সাপেক্ষ সমাধান ঐ-বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছে এবং সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের কাছে লাভ করেছে তর্কাতীত প্রতিষ্ঠা। এতদ্ব্যতীত তিনি এতে সন্ধান করেছেন মুসলিম ঐতিহ্য, অতঃপর উন্মোচন করেছেন ঐতিহ্যের স্বরূপ। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগের প্রারম্ভকালের নিম্নরূপ পরিচয় উপস্থাপন করেছেন :

> বস্তুতঃ মুসলমান অধিকার কাল হইতে এই সময় পর্যন্ত কোনও বাঙ্গালা সাহিত্য আমাদের হস্তগত হয় নাই। আমরা এই ১২০১ হইতে ১৩৫২ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত সময়কে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্ধকার বা সন্ধি-যুগ বলিতে পারি। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইলিয়াস শাহী বাদশাহ্‌রা বুঝিতে পারেন যে, আবশ্যক হইলে দিল্লীর রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং দেশের সুশাসন রক্ষার জন্য দেশের অগণিত হিন্দু প্রজাকে জানা ও তাহাদের সহানুভূতি লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। ***এইজন্য তাঁহারা দেশীয় সাহিত্যের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক হন। বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাস তাঁহাদের সময়েই প্রাদুর্ভূত হন। হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমানগণও বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মুসলমানের মিলন। এই জন্য ভাব পৃথক হইলেও ভাষায় তাঁহারা হিন্দু অনুসারী ছিলেন। এই সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রকৃত সূত্র-পাত হয়।[৪৬]

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা'র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের তিপ্পান্নজন বাঙালি-মুসলমান কবি-সাহিত্যিকের জীবন ও কাব্যসাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিবরণমুখ্য এ-গ্রন্থের ভূমিকায় এর অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বিধৃত হয়েছে গ্রন্থকারের অকৃত্রিম উচ্চারণ : "এই গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে খ্যাত ও অখ্যাত বহু গবেষকের, প্রবন্ধকারের ও লেখকের রচনা হইতে বহু খবরাখবর অম্লানবদনে স্বীকৃতিতে বা বিনা স্বীকৃতিতে গ্রহণ করিয়াছি। এই গ্রন্থে আমার কৃতিত্ব বিশেষ কিছুই নাই, আমি কেবল মালাকরের মত ইহা সংগ্রথিত করিয়াছি মাত্র। এই গ্রন্থে নানা দোষ-ত্রুটি রহিয়াছে। বিশেষতঃ তারিখের গোলযোগ, মুদ্রণ-ভ্রান্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।"[৪৭]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-রচিত 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য গৃহীত হয়; গ্রন্থাকারে এর প্রকাশ ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে। আধুনিক বাংলা-কাব্যে প্রতিফলিত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ''অতিবাস্তব ও প্রাণবন্ত'' এবং কখনো কখনো যা ''সৌহার্দ্যে ও সন্দেহে চিহ্নিত'', তার সমগ্র স্বরূপকে উন্মোচন করার প্রয়াসেই সম্পাদিত হয়েছে আলোচ্য গবেষণাকর্ম। গ্রন্থকার-প্রদত্ত 'অবতরণিকা' এ-প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য : ''বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রতিফলন অত্যন্ত প্রাণস্পন্দনময়। সমাজ জীবনে এ সম্পর্ক যেমন দ্বিধায় ও দ্বন্দ্বে, সৌহার্দ্যে ও সন্দেহে চিহ্নিত, সাহিত্যেও তেমনি তা ঘৃণায়, বিদ্বেষে, প্রীতিতে ও প্রত্যাখ্যানে সমন্বিত। চতুর্দশ শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রভাব বিচিত্র ও ব্যাপক। ···বাংলা সাহিত্যের হিন্দু ঐতিহাসিকগণ, দু'একজন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ব্যতীত, প্রধানতঃ মুসলমান সাহিত্যিকদের উপেক্ষা করতেই অভ্যস্ত। পক্ষান্তরে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরে মুসলমান গবেষকগণ মুসলমান সাহিত্যিকদের পরিচয় সঙ্কলনেই ব্যাপৃত থাকার প্রয়োজন বোধ করেছেন। ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিচারের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের এই অতি বাস্তব ও প্রাণবন্ত রূপটি সমগ্র স্বরূপে ধরা পড়ে নি। সীমিত অর্থে এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যেই বর্তমান গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের আলোকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আধুনিক বাংলা কাব্যের বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এই গবেষণার উদ্দেশ্য।''[৪৮]

ভূমিকা, উপসংহার এবং পরিশিষ্ট ব্যতীত গ্রন্থখানি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ভূমিকায় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আধুনিক বাংলা কাব্যসাধনায় হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক-রাজ-নৈতিক-সাহিত্যিক পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে হিন্দু-কবি রচিত কাহিনীকাব্যে মুসলিম-প্রসঙ্গ; আর হিন্দু-কবি রচিত খণ্ডকবিতায় মুসলিম-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করা হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'মুসলমান-কবি'র কাহিনীকাব্যে এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে মুসলমান-কবির খণ্ডকবিতায় প্রতিফলিত হিন্দুপ্রসঙ্গ হয়েছে ব্যাখ্যাত। 'উপসংহারে' গ্রন্থকার ঐ-সম্পর্কের নিম্নরূপ তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন :

> ''···বস্তুতঃ আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রতিফলিত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সমকালীন বাংলাদেশে ঐ সম্পর্কের সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের বার্তাবহ। তাই একালের প্রধান অপ্রধান প্রায় সকল কবির রচনাতেই এ সম্পর্কের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আর একালের কোন কোন রচনা সাহিত্যিক উৎকর্ষমণ্ডিত না হলেও সকল রচনাই যে তাৎপর্যপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।''[৪৯]

বর্তমান-গ্রন্থে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান নিষ্ঠাবান গবেষক হিসেবে কবির কাব্য থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি সংযোজন করেছেন, এবং প্রয়োজনানুসারে তথ্যনির্দেশ ক'রে বক্তব্যকে প্রমাণসিদ্ধ করেছেন। নিরাসক্ত এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যাত এ-গ্রন্থ এদেশের সাহিত্যগবেষণায় বিশিষ্ট সংযোজন।

আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র' ১৮৩১ থেকে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালপরিসরে ''মুসলমান-সম্পাদিত'' সাময়িক পত্রের ধারাবাহিক পরিচিতিমূলক ইতিহাস। এদেশে সাময়িকপত্রের ইতিহাস রচনার এটাই প্রথম প্রয়াস। গ্রন্থের মুখবন্ধে গ্রন্থকার এ-ধারার ইতিহাস-রচনায় কেদারনাথ মজুমদার (?—১৩৩৩ বঙ্গাব্দ), ব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৫২), বিনয় ঘোষ প্রমুখের অসম্পূর্ণতা নির্দেশ ক'রে

এ-গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁর নিম্নরূপ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন : "···মুসলমান-সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রের ধারাবাহিক তালিকানির্মাণ কিংবা এসব সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনাবলীর পূর্ণতর পরিচয়প্রদান অথবা সেসব রচনাংশ-সংকলনের প্রচেষ্টা হয়নি। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে এই অভাব পূরণের একটা প্রয়াস আছে। বর্তমান গ্রন্থে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে বাঙালী মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা থেকে আরম্ভ করে ১৯৩০ পর্যন্ত মুসলমানের উদ্যোগে প্রচারিত পত্র-পত্রিকার তালিকা নির্মাণের চেষ্টা করেছি।"[৫০] বর্তমান-গ্রন্থে তালিকাবদ্ধ হয়েছে মুসলমান-সম্পাদিত একশ চল্লিশটি সাময়িকপত্রের পরিচয় এবং উদ্ধৃত হয়েছে ঐ-পত্রিকাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-অংশ। এর গ্রন্থনায় উন্মোচিত হয়েছে এদেশের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক অনালোচিত-দিগন্ত।

আবুল হাসানাতের 'মুসলিম রচিত উপন্যাস' ব্রিটিশশাসিত পূর্ব-বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যে মুসলিম-ঔপন্যাসিকের অবদানভিত্তিক বর্ণনাধর্মী পরিচিতি-গ্রন্থ। গবেষণা-গ্রন্থের চারিত্র রক্ষিত না-হলেও এতে যে-প্রয়াস দৃষ্ট হয় তা সাহিত্যগবেষণার ধর্মসংলগ্ন। ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস অবলম্বন ক'রে ঐ-ধারার ইতিহাসসদৃশ গ্রন্থ-প্রণয়ন তাৎপর্য-ব্যঞ্জক। গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত : প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের রূপরেখা ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রভাব ও তার সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়া এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে ব্রিটিশশাসিত পূর্ব-বাংলার আঠারো জন ঔপন্যাসিকের জীবন ও কর্মের নাতিদীর্ঘ পরিচিতি। এদেশের উপন্যাস-সাহিত্যের ধারা-বর্ণনায় আবুল হাসানাতের এ-প্রয়াস নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের শ্রেণীকরণকৃত এ-পর্যায়ের সর্বশেষ গ্রন্থ মুহম্মদ মজির উদ্দীনের 'বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা' ; মুসলিম-রচিত বাংলা-নাটকের এ-ইতিহাসগ্রন্থ এ-দেশের নাট্য রচনার প্রথম ধারাবর্ণনা। গ্রন্থান্তর্গত "বাংলা নাটকে মুসলিম অনগ্রসরতা" শীর্ষক আলোচনা এর মূল্যবান সংযোজন। গ্রন্থে মুহম্মদ মজির উদ্দীনের গবেষক-নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর বর্তমান।

পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলার আলোচ্য কালপরিধিতে প্রণীত ইতিহাসমূলক বারোটি গ্রন্থের প্রায় সবই মুসলিম ঐতিহ্যের উজ্জীবনের এবং নবমূল্যায়নের প্রয়াস। তথ্যনির্ভর ও বিবরণধর্মী এই সাহিত্যগবেষণায় কখনো প্রত্যক্ষ হয় স্বাজাত্যানুরাগ, ঐতিহ্যমুগ্ধতা, কখনো দৃষ্ট হয় নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণজাত সমাজসত্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈপরীত্য পূর্ব-আলোচিত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহেরই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া-জ্ঞাপক। সাহিত্যগবেষণার দুরূহ সাধনায় সমকালীন রাজনৈতিক-বাস্তবতার পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ প্রভাব এ-দেশের শিক্ষাজীবী-সম্প্রদায়ের বহুমাত্রিক মানসপ্রবণতার পরিচায়ক।

[খ] সাহিত্যগবেষণা : মধ্যযুগ

ঐ তেরো বছরে মধ্যযুগ-নির্ভর গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ছ'টি। বর্তমান পর্যায়ভুক্ত প্রথম গ্রন্থ মযহারুল ইসলামের 'কবি হেয়াত মামুদ' ; ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য অনুমোদন-প্রাপ্ত। গ্রন্থটিতে বর্ণিত হয়েছে কবি হেয়াত মামুদের জীবনী ও কাব্য-পরিচয়, নির্ণয় করা হয়েছে কাব্যের রচনাকাল, ব্যাখ্যাত হয়েছে তাঁর কাব্যতত্ত্ব ও কাব্যে প্রতিফলিত সমাজ এবং বিশ্লেষিত হয়েছে ভারতচন্দ্র ও হেয়াত মামুদের কবি-প্রতিভার তুলনামূলক পরিচয়। তথ্যকেন্দ্রিক যুক্তিবিন্যাস এবং বিন্যস্ত যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মযহারুল

ইসলামের গবেষণা-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। হেয়াত মামুদের কবিমানস ব্যাখ্যায় তিনি কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নিম্নরূপ পার্থক্য নির্দেশ করেছেন :

> ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজসভা কবি—সুতরাং সংস্কৃতে অভিজ্ঞ রাজা ও রাজসভাসদ-গণের তৃপ্তির জন্য তাঁহাকে শব্দচয়ন ও কাহিনী নির্বাচন প্রভৃতি দিক হইতে সজাগ হইয়া কাব্য রচনায় হাত দিতে হইয়াছে। ···অন্যদিকে হেয়াত মামুদের কাব্যে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নাই, বাক্যের ঘোরপ্যাচ নাই, কিংবা কাব্যদেহের সূক্ষ্মকারুকার্যের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগের নিদর্শনও খুব বেশী নাই, কিন্তু মানুষের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য কবির প্রাণান্ত প্রয়াস আছে—আছে জীবনের গ্লানির পঙ্ক হইতে মুক্তির পিপাসা। এজন্যেই তাঁহার কাব্যে ধর্মীয় প্রেরণা ও নীতিবাদ এমন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এগুলি কবির সমাজ-সচেতন মনের পরিচয় বহন করে।[৫১]

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় গোলাম সাক্‌লায়েনের 'ফকীর গরীবুল্লাহ্'। আঠারো ও উনিশ শতকের সন্ধিকালে রচিত দোভাষী-পুথির রচয়িতা ফকির গরীবুল্লাহ্‌র পরিচয়-প্রদান বর্তমান গ্রন্থের উপজীব্য। তাঁর সুনির্দিষ্ট আবির্ভাবকাল অনাবিষ্কৃত।[৫২] আমরা তাই তাঁর কাব্যপ্রবণতা-সূত্রে এ-গ্রন্থকে মধ্যযুগের সাহিত্যগবেষণার পর্যায়ভুক্ত করেছি। এ-গ্রন্থে ফকির গরীবুল্লাহ্'র জীবনবৃত্তান্ত, তাঁর কবিকৃতি ও বর্ণনাকৌশলের বিশ্লেষণ, রচনায় প্রতিফলিত সমাজচিত্রের ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে। ক্ষুদ্রকায় এ-গ্রন্থের আলোচনা প্রধানতঃ তথ্যনির্ভর।

আহমদ শরীফের 'সৈয়দ সুলতান—তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ' ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য লিখিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এ-গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যহেতু বর্তমান নিবন্ধ রচনাকালে আমরা অবলম্বন করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত মূল গবেষণা-অভিসন্দর্ভ। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত মধ্যযুগের পুথিসাহিত্য সম্পাদনা ক'রে আহমদ শরীফ নির্মাণ করেছেন এক বিশাল গবেষণা-জগৎ। সৈয়দ সুলতানের সাহিত্যকর্ম গবেষণার বিষয়াবলম্বন করার কারণ এবং তাঁর অবদান-প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের উক্তি উদ্ধৃত হল : "পড়া-শোনায় ও অনুসন্ধানে যতই এগিয়েছি, ততই মনে হয়েছে সৈয়দ সুলতান কবিমাত্র নন, তিনি চট্টগ্রামী মুসলমানদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একজন যুগন্ধর ও যুগস্রষ্টা। দেশজ মুসলিম মনে ইসলামী জীবনবোধ জাগানোই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে তিনি সৃষ্টিপত্তন থেকে হাসর অবধি মুসলিম জীবন-ধারার আলেখ্য খাড়া করতে চেয়েছিলেন।[৫৩]

সাহিত্যগবেষণায় আহমদ শরীফ গ্রহণ করেন বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ; তাঁর বিশ্লেষণরীতি সর্বদাই দেশকাল-সাপেক্ষ, তাই দেখা যায় মধ্যযুগের সাহিত্য বিশ্লেষণ ক'রে তিনি এ-দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। অভিসন্দর্ভের প্রস্তাবনায় তিনি তাঁর আলোচ্য বিষয় এবং অনুসৃত বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন :

> ষোল শতকের কবি সৈয়দ সুলতান ছিলেন একাধারে কবি, পীর, সূফী সাধক ও শাস্ত্রবেত্তা। তিনি মীর বংশজ। কাজেই তাঁকে ষোল শতকের একজন অভি-জাত, শিক্ষিত, পণ্ডিত, ধার্মিক, সূফী, পীর ও কবি হিসেবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ মেলে আমাদের। এজন্য তাঁকে আদর্শ মুসলমান, যুগ-সংস্কৃতির প্রতিভূ,

> সমকালীন সমাজ মানসের প্রতিনিধি স্থানীয় চিত্রকর এবং লোক-মনীষার ধারক ও ভাষ্যকার রূপে গ্রহণ করা অসঙ্গত নয়। তাঁর রচনার পরিসরে তাঁর মানস উপাদান বিশ্লেষণ করে আমরা ষোল শতকের বাঙ্গলার অন্ততঃ বাঙ্গলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চল—চট্টগ্রামের মুসলমানদের জগৎ ও জীবন-ভাবনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে পারি,— এ বিশ্বাসই সৈয়দ সুলতানের কাব্যপাঠে আমাদের উৎসুক করেছে। ধর্মবোধে ও আচরণে, ব্যবহারিক জীবন চর্চায়, সাংস্কৃতিক বোধে কিংবা সামাজিক আচার-আচরণে, লোক-মানসের যে--বিচিত্র অভিব্যক্তি ঘটেছে, গণসমাজের সে-স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গির অন্তর্নিহিত প্রেরণাজাত ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করা ও তাকে স্বরূপে উপলব্ধি করার প্রয়াসই আমাদের লক্ষ্য।[৫৪]

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ অবলম্বিত এ-গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে যথাক্রমে ষোড়শ শতাব্দীর চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পটভূমি, চট্টগ্রাম-অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং "সৈয়দ সুলতানের জন্মভূমি, পরিচয় এবং সৈয়দ সুলতানের ভাবশিষ্য কবিগণ ও আবির্ভাবকাল" প্রসঙ্গ বিশ্লেষিত হয়েছে। আহমদ শরীফের এই সমাজতাত্ত্বিক-বিশ্লেষণ এ-দেশের সামাজিক ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এতদ্ব্যতীত সাতটি পরিচ্ছেদে তিনি প্রধানতঃ সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থাবলীর পরিচিতি, তাঁর অধ্যাত্মসাধনা এবং চট্টগ্রাম-অঞ্চলের ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান ব্যাখ্যা করেছেন।

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় সৈয়দ আলী আহসানের 'পদ্মাবতী'। এ-গ্রন্থটি 'গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সাহিত্য-সমালোচনার অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।'[৫৫] এ-দেশের সাহিত্যগবেষণায় সৈয়দ আলী আহসান বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। সাহিত্য-গবেষণায় তুলনামূলক বিচারপদ্ধতি প্রয়োগে তিনি পথিকৃৎ; তাঁর 'পদ্মাবতী' আধুনিক তুলনামূলক সাহিত্যবিবেচনার বিশিষ্ট নিদর্শন। এ-দেশের সাহিত্যগবেষণায় বিবরণধর্মিতার যখন প্রাধান্য, সে-সময় সাহিত্যবিবেচনার তুলনামূলকপদ্ধতি আরোপে সৈয়দ আলী আহসান তাঁর আন্তর্জাতিকমনস্কতাকে অভিব্যক্ত করেছেন। বর্তমান-গ্রন্থ একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ; প্রথমত এতে সন্নিবেশিত হয়েছে মালিক মুহম্মদ জায়সী-রচিত 'পদুমাবত'-এর গ্রন্থকারকৃত গদ্যানুবাদ, দ্বিতীয়তঃ পাঠ নির্ধারিত হয়েছে আলাওল-রচিত 'পদ্মাবতী' কাব্যের। অতঃপর তিনি এ-দুই কাব্যের তুলনামূলক পাঠ-সমালোচনা ক'রে দুই কবির সার্থকতা, স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা নির্দেশ করেছেন। এবং সংযোজন করেছেন কাব্যের টীকা-টিপ্পনী-সম্বলিত কাব্যরস-বিশ্লেষণ ও অলঙ্কারপর্যালোচনা। জায়সী ও আলাওলের মানসপ্রবণতার তুলনামূলকবিচারে তাঁর বিশ্লেষণ-রীতি ও ভাষাবিন্যাস লক্ষণীয়:

> জায়সী এবং আলাওল উভয়েই মহাপণ্ডিত ছিলেন। উভয়েরই অধ্যয়ন ছিল প্রচুর। সংস্কৃত ও আরবী ভাষার উপর অধিকার ছিল প্রগাঢ়, বিভিন্ন তত্ত্বপরীক্ষায় এঁদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না, কিন্তু সর্বোপরি কবিতায় জীবন-বিবেচনার যে স্বাক্ষর রেখেছেন তা বিস্ময়কর।
>
> ···চারণ কবিদের বীরকাব্যগাথা এবং পূর্ববর্তী কবিদের বিশেষ ক'রে কবীরের ভাবৈশ্বর্য জায়সীর চিন্তা এবং কল্পনায় প্রভাব বিস্তার ক'রে ছিলো। জায়সীর কাব্যের পরিপূর্ণ রসোপভোগের পর বাংলাতে দক্ষতার সঙ্গে তা উপস্থিত করবার মধ্যে আলাওলের যে জ্ঞান-গভীরতার পরিচয় পাই তার তুলনা হয় না। তাছাড়া আলাওলের জ্ঞানের উৎস সর্বদা জায়সী নন। বিভিন্ন সংযোজনার মধ্যে তা প্রমাণিত হয়।[৫৬]

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের রোম্যান্সমূলক প্রণয়কাব্যের পরিচিতি-প্রদান এবং সাহিত্যমূল্য-নির্ণয় ওয়াকিল আহমদের 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' গ্রন্থের উপজীব্য।

গ্রন্থ-প্রণয়নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে এই ভাষ্যে : "প্রাচীন কালের বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ধারার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করব এরূপ আশা পোষণ করে গ্রন্থখানি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি। সাহিত্যের সুবিজ্ঞ গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নয়, সাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছি। এজন্য কাব্যের পাণ্ডুলিপি, রচনাকাল, কবিজীবনী ইত্যাদি প্রশ্নকুটিল ও তর্কজটিল সমস্যায় প্রবেশ করিনি বরং কবিকর্ম, কাব্যসৌন্দর্য, রসতাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ের রূপ-সার্থকতার উপর অধিক আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।"[৫৭] এদেশে মধ্যযুগের সাহিত্যগবেষণা মুখ্যতঃ পাণ্ডুলিপি-পরিচয়ে, কাব্যের রচনাকাল এবং কবির আবির্ভাবকাল ও আবাসস্থল নির্ণয়ে তর্কবিতর্ক-মুখর। এই পটভূমিতে গবেষকের নিষ্ঠা নিয়ে তাঁর সাহিত্যমূল্য বিশ্লেষণের প্রয়াস এ-ধারার সাহিত্যগবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

মমতাজুর রহমান তরফদারের 'বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি' গ্রন্থের প্রকাশকাল জানুয়ারী, ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দ। এর উপজীব্য বাংলা রোম্যান্সমূলক প্রণয়-কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি বিশ্লেষণ এবং সাহিত্যমূল্য নির্ণয়। গ্রন্থের শিরোনামায়-যুক্ত "রোমান্টিক কাব্য" সম্পর্কে গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা লক্ষণীয় : " ···যে কাব্য সাহিত্যে প্রেম ও এ্যাড্‌ভেন্‌চারই বিষয়বস্তুর প্রধানতম অংশ, 'রোমান্টিক কাব্য' বলতে আমি তার কথাই বুঝিয়েছি। মধ্যযুগের বাংলা ও হিন্দী কাব্যে আধুনিক রোমান্টিসিজমের ধারণা প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ···জায়সীও রোমান্টিক নন, তিনি নিঃসন্দেহে ক্লাসিক্যাল পর্যায়ের কবি। এই গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে আমি বলেছি যে, ক্লাসিক্যাল কবিগণ আধুনিক রোমান্টিক কবিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।"[৫৮] একাধিক ভাষাজ্ঞান, সত্যসন্ধ ইতিহাস রচয়িতার দৃষ্টিকোণ এবং দার্শনিক-ধর্মতাত্ত্বিক-সাহিত্যিক ব্যাখ্যা সমন্বিত হ'য়ে বর্তমান-গ্রন্থে উপজীব্য-প্রসঙ্গ বিশ্লেষিত হয়েছে। ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত এ-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে "ফারসীর প্রভাব ও ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যচর্চা", "সূফী দর্শন ও আওয়াধী-হিন্দী কাব্য", "বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় আবহ : অনুবাদ সাহিত্যের মানবীয় বৈশিষ্ট্য", "আওয়াধী-হিন্দী কাব্যে প্রেম" শীর্ষক মূল্যবান আলোচনা স্থান পেয়েছে। অতঃপর বিভিন্ন অধ্যায়ে বাংলা রোম্যান্সমূলক প্রণয়কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মওলানা দাউদ, সাধন, কুতবন, মনঝন এবং মালিক মুহম্মদ জায়সীর কাব্যের সঙ্গে বাঙালি-কবি দৌলত কাজী ও আলাওলের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা হয়েছে সন্নিবেশিত। এতদ্ব্যতীত "আওয়াধী-হিন্দী কাব্যের দার্শনিক তত্ত্ব", "আওয়াধী-হিন্দী কাব্যের সাহিত্যরীতি ও ঐতিহ্য" এবং "আওয়াধী-হিন্দী কাব্যে সমাজচিত্র" শীর্ষক আলোচনা ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের গুরুত্বকে করেছে প্রসারিত।

পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলার ঐ-তেরোবছর কালপরিসরে সম্পন্ন মধ্যযুগের সাহিত্য-ভিত্তিক গবেষণা প্রধানতঃ এ-দেশের সামাজিক ইতিহাস সন্ধানে এবং ঐতিহ্যের নবমূল্যায়নে নিবেদিত। সাহিত্যমূল্য নির্ণয়, সাহিত্যের ইতিহাসে কবিদের স্থান নির্দেশের প্রয়াস, এ-পর্যায়ের সাহিত্যগবেষণায় আমরা লক্ষ্য করি। এ-ধারার মুগ্ধচিত্ত গবেষকরা যেমন প্রয়াসী হয়েছেন ঐতিহ্যের উজ্জীবন ঘটাতে, তেমনি সত্যসন্ধ গবেষক নিরপেক্ষ সাহিত্যগবেষণার দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন।

[গ] লোকসাহিত্য-গবেষণা

আলোচ্য সময়সীমায় প্রকাশিত লোকসাহিত্য-বিষয়ক বিশ্লেষণ ও বিবরণধর্মী গ্রন্থের সংখ্যা ও মান আশাব্যঞ্জক নয়। এর অধিকাংশই বিবরণসর্বস্ব এবং তথ্যভারাক্রান্ত।

সাহিত্যমূল্যায়নের পরিবর্তে রচনাকাল-নির্ণয়, পাশ্চাত্যগ্রন্থনির্ভর-সংজ্ঞানিরূপণ এবং লোকসাহিত্য-সংগ্রহের ইতিহাস ব্যাখ্যা এ-ধারার গ্রন্থসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত আশরাফ সিদ্দিকীর 'লোক-সাহিত্য' লোকবিজ্ঞানের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অনুসারী। গ্রন্থের বিষয়ক্রমে আছে লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি, লোকসাহিত্য সংগ্রহ সংস্থা, লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও তার বিভিন্ন ধারা এবং আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে তার পার্থক্য। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নির্ণয়ে দেশী-বিদেশী লোকবিজ্ঞানীর মন্তব্য ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হ'লেও গ্রন্থকারের নিজস্ব বক্তব্য সংযুক্ত হয়নি। এ-গ্রন্থ প্রণয়নে তথ্য-সংগ্রাহকের পরিশ্রম এবং বিন্যাসকের সততার স্বাক্ষর রেখেছেন গ্রন্থকার; কিন্তু সংগৃহীত তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে তিনি সাবিক-অর্থে অঙ্গীকার করেননি। এর অধিকাংশ অধ্যায়েরই সূচনায় উদ্ধৃত হয়েছে বিভিন্ন লোকবিজ্ঞানীর মন্তব্য; লোকবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক পঠন-পাঠন পদ্ধতি পরিচয়-বিন্যাসক হিসেবে এদেশের সাহিত্যগবেষণায় আশরাফ সিদ্দিকীর অবদান স্মরণীয়। একই বছরে প্রকাশিত আনোয়ারুল করিমের 'বাউল কবি লালন শাহ' গ্রন্থে গবেষকের অনুসন্ধিৎসা দৃষ্ট হ'লেও, গবেষণার শৃঙ্খলা এতে অক্ষুণ্ন থাকেনি। আনোয়ারুল করিম বিন্যাস করেছেন তথ্য, নির্দেশ করেছেন প্রমাণ; কিন্তু তথ্যের সমর্থনে উপস্থাপন করেননি উপাদান-উৎস।

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মযহারুল ইসলামের 'ফোকলোর পরিচিতি এবং লোক সাহিত্যের পঠন-পাঠন' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ-ধারার সাহিত্যের সংজ্ঞা, এর সংগ্রহের সারকথা ও বিভিন্ন মতবাদ, লোককাহিনীর সম্পাদনা-পদ্ধতি, ইউরোপীয় লোককাহিনীর বিভিন্ন-দেশীয় পাঠান্তর, চীনা লোককাহিনীর আঙ্গিক-ব্যাখ্যা ও ভাষাতাত্ত্বিক বিচার এবং এদেশীয় উপজাতির লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার প্রসঙ্গ। মযহারুল ইসলাম এতে 'Floklore'-এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'লোকলোর' শব্দ গ্রহণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। লোকসাহিত্য পঠন-পাঠনের এই নির্দেশনা-গ্রন্থ, এদেশের বিজ্ঞানভিত্তিক লোকসাহিত্য-চর্চায় মূল্যবান সংযোজন। অভিন্ন বছরে প্রকাশিত মুহম্মদ আবদুল হাফিজের 'লোক-কাহিনীর দিক্-দিগন্ত' কয়েকটি বিদেশী গ্রন্থের উপাদান-নির্ভরতায় রচিত।[৫৯]

মুহম্মদ আবু তালিবের 'লালন শাহ্ ও লালন-গীতিকা' স্পষ্টতই বিভিন্ন গবেষণাকর্মের প্রতিক্রিয়ায় রচিত।[৬০] আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার সঙ্কলন করেছেন লালন শাহের (১৭৭২--১৮৮৮) জীবনী, ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর ধর্মমত, জীবনদর্শন ও কবিপ্রতিভার বিস্তৃত পরিচয় এবং সংযোজন করেছেন লালন শাহ্-এর দুশো আশিটি গান। এতে গবেষক যে-ভাষারীতি গ্রহণ করেছেন তা' নিরাসক্ত সাহিত্যগবেষণায় গ্রহণযোগ্য কিনা তা তর্ক-সাপেক্ষ। সত্যসন্ধানী গবেষক সর্বদাই ভাবাবেগমুক্ত, তিনি অবলম্বন করেন অকাট্য যুক্তি, অতঃপর স্থাপন করেন নির্ণীত প্রমাণ। আলোচ্য গ্রন্থে মুহম্মদ আবু তালিবের লেখনীতে সাহিত্যগবেষণার এই রীতি হয়েছে বিপর্যস্ত। উদাহরণ দ্রষ্টব্য:

> "বসন্ত-বাবু [বসন্তকুমার পাল] কাহিনীটি কাহিনী হিসেবে চমকপ্রদ, তাঁর বর্ণনাভঙ্গীও চমৎকার। বিশেষ করে মাতৃসদন থেকে লালনের বিদায় মুহূর্তের যে মর্মস্পর্শী ছবি তিনি অঙ্কন ক'রেছেন, তার সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট রয়েছে; কাহিনীর নাটকীয় গতিও উল্লেখযোগ্য; কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্ব-কথিত লালন-জীবনীর সংগে তার কোন সংগতি না থাকায় তাকে কিছুতেই সত্যি ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে না। লালন-জীবন সংক্রান্ত এই কাহিনীর সংগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্পের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। ভাওয়াল-সন্ন্যাসীর মামলার সংগে সাদৃশ্যও বেশ দেখা যায়।"[৬১]

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মযহারুল ইসলামের 'লোক কাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস' তাঁর পিএইচ. ডি. গবেষণা-অভিসন্দর্ভের ছায়াবলম্বনে পরিকল্পিত।[৬২] বর্তমান-গ্রন্থে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ প্রশাসনিক কর্মচারী এবং ইউরোপীয় মিশনারীদের ভূমিকা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস এবং সংগ্রহগ্রন্থসমূহের "ঐতিহসিক ও সমালোচনা মূলক পর্যালোচনা" লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শ্রেণীকরণকৃত এ-পর্যায়ের সর্বশেষ গ্রন্থ আনোয়ারুল করীম প্রণীত 'বাউল সাহিত্য ও বাউল গান'। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এ-গ্রন্থ বাউলমতবাদ-উদ্ভবের এবং বাউল-সম্প্রদায়ের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা। এতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বাউল গানে বিধৃত সূফী-মতবাদ ও তার প্রভাব এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি-নির্দেশক গানের তাৎপর্য। বারো জন বাউল-সাধকের পরিচিতি ও গান সংযোজন, গবেষণার বিষয় ও বক্তব্যকে করেছে প্রামাণিক।

আলোচ্য সময়পরিসরে লোকসাহিত্যবিষয়ক গবেষণা দেশকালের রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যব্যঞ্জক। মুগ্ধচিত্তের ঐতিহ্যসন্ধান যখন সাহিত্যগবেষণার প্রধান প্রবণতা, তখন জনশ্রুতি থেকে লোকসাহিত্যের সংগ্রহ, এবং সংগৃহীত উপাদানের নব-মূল্যায়ন, ঐতিহ্য-সন্ধানের ক্ষেত্রে সংযোজন করেছে ভিন্ন মাত্রা।

[ঘ] গবেষণামূলক প্রবন্ধসঙ্কলন

এদেশের বিভিন্ন গবেষণাপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশই অগ্রন্থিত; গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গভিত্তিক এ-সব প্রবন্ধের গ্রন্থভুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালপরিধিতে প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধসঙ্কলনের মধ্যে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', গোলাম সাকলায়েনের 'মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক' এবং মুস্তাফা নূরউল ইসলামের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' উল্লেখযোগ্য। উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহের অন্তর্গত অধিকাংশ প্রবন্ধই বাঙালি-মুসলমান সাহিত্যি-কের অবদান ব্যাখ্যা এবং মুসলিম-ঐতিহ্য মূল্যায়নের প্রচেষ্টায় রচিত। পাকিস্তান-শাসিত পূর্ব-বাংলায় এ-জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনায় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রবন্ধগুচ্ছে বাংলাসাহিত্যের সামগ্রিক রূপ অনুভববেদ্য ক'রে তোলার একাগ্রতা লক্ষণীয়। গ্রন্থে বিন্যস্ত প্রবন্ধসমূহের শিরোনামা হচ্ছে—"উন্মেষ যুগের বাংলা গদ্যে মুসলিম প্রসঙ্গ", "প্যারীচাঁদ-মানস", "গল্প-গুচ্ছের মুসলিম চরিত্র", "উদাসী-কাব্য" এবং "বাংলা ছন্দ ও আধুনিক বাংলা কবিতা"। গোলাম সাকলায়েনের 'মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক'-গ্রন্থের শিরোনামাই তাঁর অবলম্বিত বিষয় ও উদ্দেশ্যের নির্দেশক। বর্তমান গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধসমূহ মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ—এই দুইভাগে বিভক্ত। এতে দুই যুগের বাঙালি-মুসলমানের সাহিত্যসাধনার পরিচয় ব্যাখ্যাত হয়েছে। তথ্যনির্দেশে অনিয়ম এবং বিভিন্ন প্রবন্ধে বাক্যবিন্যাসরীতির বিভিন্নতা এ-জাতীয় সঙ্কলনের চারিত্রকে অক্ষুণ্ন রাখেনি। 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য'-শীর্ষক প্রবন্ধ-সঙ্কলনের রচয়িতা মুস্তাফা নূরউল ইসলাম তাঁর এ-গ্রন্থে আধুনিক বাংলাসাহিত্য-সাধনায় এবং সাময়িকপত্র প্রকাশনায় বাঙালি-মুসলমানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। এর সূচিতে রয়েছে "আধুনিক জনমতের উন্মেষ ও সাময়িক পত্র সাধনা", "প্রথম সাময়িক পত্র—সমাচার সভারাজেন্দ্র", "বিষাদ-সিন্ধু", "আনোয়ারা", "স্পেন-বিজয় কাব্য" এবং "শেখ ফজলুল করিমের গদ্য রচনা"।

বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধসঙ্কলন তিনটিতে প্রধানতঃ অনুসন্ধান করা হয়েছে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান, অতঃপর নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু কিছু প্রবন্ধে অন্বেষণ করা হয়েছে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ। আলোচিত সঙ্কলনগ্রন্থগুলি উল্লিখিত-কালের গবেষণার মূল প্রবণতাকেই করে অভিব্যক্ত।

[ঙ] আধুনিকসাহিত্য গবেষণা

পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলার ঐ-কালপরিসরে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থের সংখ্যা আশাব্যঞ্জক না হলেও সমকালীন দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ-সময়ের সাহিত্যগবেষণা যেখানে প্রধানতঃই ঐতিহ্যসন্ধানী ও ইতিহাসপ্রবণ, সেখানে আধুনিকসাহিত্যের চর্চা সন্দেহাতীতভাবে রচনা করেছে নতুন প্রবণতা। সমকালীন সাহিত্যকে গবেষণার অঙ্গীভূত করা ঐ-ধারার সাহিত্যগবেষকদের আধুনিকমনস্কতার পরিচায়ক। বলা আবশ্যক, এ-কালের আধুনিকসাহিত্য-গবেষণার অন্তরেও প্রচ্ছন্ন আছে শাসকগোষ্ঠীর নীতির ও সমকালীন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব। বর্তমান পর্যায়ের শ্রেণীকরণকৃত গ্রন্থের সংখ্যা চৌদ্দ; এর তিনটি জ্ঞানপীঠে গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রূপে প্রথমে উপস্থাপিত হ'লেও, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। আমরা গবেষণার সমকালের প্রভাবের গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে উপস্থাপনকালকে প্রকাশকাল হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং আলোচনার সুবিধার্থে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক গবেষণাকর্মের পুনর্শ্রেণীকরণ করেছি। ফলশ্রুতিতে কালক্রম বিঘ্নিত হ'লেও গবেষকদের কর্মপ্রয়াসের পরিচয় অনুধাবনে তা' অধিকতর কার্যকর হবে।

পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলার দ্বিতীয় কালপর্বে রবীন্দ্রসাহিত্য-বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ রচিত হয়েছে পাঁচটি। উল্লেখযোগ্য, এ-দেশের আধুনিকসাহিত্য-গবেষণায় সর্বপ্রথম উপজীব্য হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্য। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত আনোয়ার পাশার 'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা' (প্রথম খণ্ড) শীর্ষক গ্রন্থ দিয়েই এ-ধারার সাহিত্যগবেষণার যাত্রা শুরু। তাঁর এ-গ্রন্থপ্রণয়নের পশ্চাৎপটে আবেগ-ভক্তি[৬৪] প্রচ্ছন্ন থাকলেও বিবেচনায় ও বিশ্লেষণে তিনি আবেগমুক্ত স্বনিষ্ঠ-গবেষক। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্য ক'রে প্রচণ্ড রবীন্দ্র-বিরোধিতার যুগে গল্পগুচ্ছকে সাহিত্য গবেষণার উপজীব্য করা এবং সার্থকভাবে গ্রন্থপ্রণয়ন ও প্রকাশন সমকালীন বৈরী-দেশকালের প্রেক্ষাপটে একটি সাহসী ও ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। মূল্যায়নধর্মী এ-গ্রন্থকে বিষয়গত দিক থেকে আনোয়ার পাশা তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ভাগে "গল্প পরিক্রমা : সাধারণ আলোচনা" শিরোনামায় তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড 'গল্পগুচ্ছে'র সাহিত্যমূল্য-বিশ্লেষণ এবং রবীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবন ও শিল্পীমানস তথা ছোটগাল্পিক শিল্পদৃষ্টির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন দেশ ও কাল এবং তৃতীয় ভাগে বিশ্লেষিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-অনুধাবনে ভারতীয় ও ইউরোপীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার এবং এর থেকে উৎপন্ন তাঁর স্বতন্ত্র প্রকৃতিবোধ এবং প্রকৃতিনির্ভর ও প্রকৃতি-অনুষঙ্গী গল্পসমূহ। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের শেষে তিনি সংযোজন করেছেন মূল্যবান পরিশিষ্ট। এতে আলোচিত হয়েছে "বাংলা ছোটগল্পের দেশ-কালগত পটভূমি ও রবীন্দ্রমানস" "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ক্ষেত্রে উত্তরণ", "বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প-রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা ও রবীন্দ্রনাথ"—প্রভৃতি প্রসঙ্গ। ইতোপূর্বে-সম্পন্ন এ-দেশের গবেষণাকর্ম ছিল প্রধানতঃই বিবরণমূলক; কিন্তু আনোয়ার পাশার এ-গ্রন্থে আমরা প্রত্যক্ষ করি ব্যাখ্যা ও বিবরণের স্থলে মূল্যায়নবিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' গল্পের পরিণাম এবং নায়কের ব্যর্থতা-বিষয়ে গ্রন্থকারের মূল্যায়নপদ্ধতি লক্ষণীয়:

> ···গল্পের শেষে নায়ক যে তার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য "একটি অনন্তরাত্রির উদয়" দেখতে পেয়েছে সেটি, একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, এক জাতীয় আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়। এবং আদর্শবাদী একজন যুবকের পক্ষে জীবনের ব্যর্থ-লগ্নে এমনি আত্মপ্রবঞ্চনার নিরাপদ গুহায় নিজেকে লুকিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। জীবনের শুরু থেকেই যে ব্যক্তি কল্পনা-

বিলাসে পটু, জীবনের ব্যর্থতাকেও সে যে কল্পনা দিয়েই ভ'রে নিতে চাইবে সেইটেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।[৬৪]

রবীন্দ্র-ছোটগল্পে প্রকৃতির ভূমিকা বিশ্লেষণে তাঁর নির্দেশিত সূত্র গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় উদ্ধৃত হল :

[ক] প্রকৃতি শুধুই পটভূমি নয়, একেবারে গল্পের প্রধান অঙ্গ হয়ে কোথাও বা চরিত্র হয়ে, কোথাও বা কোন চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিলেমিশে গিয়ে গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে আছে।[৬৫]

[খ] রবীন্দ্র-ছোটগল্পে প্রকৃতি মানুষের আত্মীয় সকল ক্ষেত্রেই মানুষের প্রিয়জন হবে এমন কোনো কথা নেই, সে শত্রুতাও করে। কখনো সহানুভূতি কখনো বিদ্রূপ, কখনো আগ্রহ, কখনো ঔদাসীন্য—এমনি নানা ভূমিকায় প্রকৃতিকে উপস্থাপিত ক'রে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চিরন্তন সম্পর্কের বিষয়টিকে গল্পের মধ্যে বিধৃত ক'রে রাখা হয়েছে।[৬৬]

আনোয়ার পাশা ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতার প্রাক্কালে পাক-রাজাকার বাহিনীর হাতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘদিন পর ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা' দ্বিতীয় খণ্ড। আলোচ্য কালপরিসরে রচিত বলে গ্রন্থটিকে আমরা বর্তমান-পর্যায়ের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছি। এ-গ্রন্থে আনোয়ার পাশা আলোচনা করেছেন তৃতীয় খণ্ড 'গল্পগুচ্ছ', 'তিনসঙ্গী', 'লিপিকা', 'সে' ও 'গল্পসল্প'। এত-দ্ব্যতীত, এতে সংযুক্ত হয়েছে ছোটগল্পের অঙ্গসংগঠন এবং রবীন্দ্র-ছোটগল্পের আঙ্গিক প্রসঙ্গে সুচিন্তিত আলোচনা।

সৈয়দ আকরম হোসেন রচিত 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : দেশকাল ও শিল্পরূপ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত গবেষণা-নিবন্ধের গ্রন্থরূপ। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং নন্দনতত্ত্বের সমন্বয়ে প্রণীত এ-গ্রন্থ এদেশে রবীন্দ্র-উপন্যাস গবেষণায় পথিকৃতের দাবীদার।[৬৭] আনোয়ার পাশার 'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা' এবং সৈয়দ আকরম হোসেনের 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : দেশকাল ও শিল্পরূপ' এদেশের সাহিত্যগবেষণায় রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যকে প্রতিভাত ক'রতে সমর্থ হয়েছে। এ-গ্রন্থে গ্রন্থকার নিরাবেগ ও নিরাসক্তভাবে মূল্যায়ন-প্রয়াসী। উদাহরণ অনুধাবনীয় :

> ··রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী--সে সাহিত্য বিষয়ক হোক আর ধর্ম-রাষ্ট্র-সমাজ প্রসঙ্গেই হোক,--তাঁর সমগ্র জীবনগঠনের উপাদান অর্থাৎ পরিবেশ ও আব-হাওয়ার মধ্যে লালিত ও বর্ধিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যপ্রিয়তা, বিশ্ববোধ, সমন্বয়বাদ, স্বাতন্ত্র্যে শ্রদ্ধাশীলতা, বৈদগ্ধ্য ও শিল্পদৃষ্টির প্রসারতা ইত্যাদি তাঁর সমাজ-মন, শিল্পদৃষ্টি ও ধর্মবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন সত্তা নয়। বরং তাঁর শিল্পদৃষ্টি যেমন ধর্মবোধ ও সমাজমন দ্বারা প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত, তেমনি সমাজ-মন ও ধর্মবোধ প্রতিমুহূর্তে শিল্পদৃষ্টি দ্বারা পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত। বস্তুতঃ সব কিছু উপাদান একত্রিভূত হয়ে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও জগৎ-দর্শন।[৬৮]

আলোচ্য-গ্রন্থে গ্রন্থকার সমালোচক-প্রতিষ্ঠিত মতবাদকে যুক্তি, ব্যাখ্যা ও প্রমাণ-সাপেক্ষে বর্জন ক'রে রবীন্দ্রনাথের 'করুণা'-কে রবীন্দ্র-শিল্পদৃষ্টির ক্রমপরিণতির ক্ষেত্রে গুরুত্ব-সহকারে বিবেচনা করেছেন। ভূমিকা এবং উপসংহার ব্যতীত গ্রন্থটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে "উপন্যাস বিচারের ভূমিকা"; এতে উপন্যাসের কলা-প্রকৌশল এবং সংগঠন-বৈশিষ্ট্য গ্রন্থকার এমনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যা' স্বতন্ত্র গবেষণা-নিবন্ধ হিসেবেও তাৎপর্য বহন করে। দ্বিতীয় ভাগে তিনি রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য, পারিবারিক পরিবেশ, সমকালীন দেশকাল প্রভৃতি বিশ্লেষণ ক'রে "রবীন্দ্রমানসের উপাদান ও স্বরূপ" নির্ণয় করেছেন। তৃতীয় ভাগে বিচার করেছেন রবীন্দ্র-উপন্যাসে প্রতিফলিত ও উপস্থাপিত দেশকাল, এবং চতুর্থভাগে বিশ্লেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছেন উপন্যাসশিল্প-নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের নৈপুণ্য এবং শিল্প হিসেবে রবীন্দ্র-উপন্যাসের সার্থকতা।

বপূর্বালোচিত বৈরী-প্রতিবেশে রচিত আহমদ কবিরের 'রবীন্দ্রকাব্য : উপমা ও প্রতীক' এং হুমায়ূন আজাদের 'রবীন্দ্রপ্রবন্ধ : রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা' যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষার জন্য লিখিত গবেষণা-নিবন্ধের মুদ্রিত-রূপ। এরমধ্যে প্রথমটির গ্রন্থকারে প্রকাশকাল ১৯৭৪, দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। এদেশের সাহিত্যগবেষণায় রবীন্দ্রকাব্যকে বিষয়াবলম্বন করার প্রথম কৃতিত্ব আহমদ কবিরের। বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাকিস্তান-শাসিত পূর্ব-বাংলার আইয়ুবী-দশকে ছিলেন উপেক্ষিত; শাসকবর্গের এ-উপেক্ষার ধ্বনি-প্রতিধ্বনির, বিরোধ ও প্রতিরোধের চিত্ররূপ অঙ্কিত হ'য়ে আছে এ-দেশের সাংস্কৃতিক-আন্দোলন ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাসের পাতায়। বর্তমান-গ্রন্থে আহমদ কবির নির্মোহ দৃষ্টিতে সন্ধান করেছেন রবীন্দ্র-কাব্যান্তর্গত উপমা ও প্রতীক। আলোচ্য বিষয় ও নির্ণেয় বক্তব্য সম্পর্কে গ্রন্থকারের উক্তি উদ্ধৃত হল :

> কাব্যদেহে উপমা, রূপক বা প্রতীকের বিভাজন-প্রক্রিয়া সব সময় সম্ভব হয় না। উপমা-রূপক-প্রতীক, এ-গুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; সে জন্যে যা উপমা বলে পরিচিত, তাই আবার প্রতীকী ভাবসংকেত সম্পন্ন, যা প্রতীক তাই হয়তো রূপক। এর কারণ অনুসন্ধানে জানা যাবে কবিতার অন্তর্নিহিত রহস্য কোন একটি সীমাবদ্ধ রূপবন্ধে ধরা দেয় না। দেয় না বলেই উপমা, রূপক বা প্রতীকের সঠিক সূত্রনির্ণয় অনেক সময় দুরূহ। বর্তমান গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে যে আলোচনা হয়েছে তাতে রবীন্দ্রকাব্যের উপমা ও প্রতীকের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো সম্মিলিতভাবেই অনুধাবনযোগ্য।[৬৯]

বর্তমান-গ্রন্থ তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থকার বিশ্লেষণ করেছেন অলঙ্কার-প্রয়োগের মূলসূত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রধানতঃ সনাক্ত করেছেন রবীন্দ্রকাব্যান্তর্গত উপমা, বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্র-উপমার প্রকৃতি, পুরাণ-প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্র-উপমার স্বরূপ। তিনি তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রযুক্ত রূপক ও প্রতীক প্রসঙ্গ।

হুমায়ূন আজাদের 'রবীন্দ্রপ্রবন্ধ : রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা' গ্রন্থে রবীন্দ্রসাধনার এক বিশিষ্ট প্রান্ত—প্রবন্ধ-সাহিত্যের ঘটেছে উন্মোচন। ১৮৯১ থেকে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালপ্রবাহে রচিত রবীন্দ্র-প্রবন্ধে রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তার যে প্রতিফলন ঘটেছে তা' ব্যাখ্যা করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।[৭০] গ্রন্থভুক্ত বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন "স্বকালের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ", "রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা", "মুসলমান ও হিন্দুমুসলমান

সম্পর্ক", "ইউরোপ ও ইংরেজ বনাম ভারত ও ভারতবাসী", "শিক্ষাচিন্তা" প্রভৃতি প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা সম্পর্কে গ্রন্থকারের বক্তব্য উদ্ধৃত হল :

> দেশের উন্নতি বলতে তিনি বুঝেছেন সমাজের উন্নতি। সমাজ যদি উন্নত হয়, তার মধ্যে যদি আবার প্রাণ জাগানো যায়, তবে দেশের মুক্তি ঘটবে, এটা ছিলো তাঁর উপলব্ধি। ১৯০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজে' সমাজোন্নয়নের পদ্ধতি দান করেন, এবং পরবর্তী জীবনে তাকে বারবার ব্যাখ্যা করেন। দেশসেবাকে তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়েছেন, এমন কি স্বাধীনতারও উপরে। বিদেশী শাসন তাঁর কাছে বড়ো সমস্যা ছিলো না, পল্লীর পতনই বড়ো সমস্যা। পল্লীর উন্নতি বিধান তাঁর স্বদেশচিন্তার মূল কথা।[৭১]

আলোচ্য সময়সীমায় মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যকে ভিত্তি ক'রে রচিত হয়েছে দু'টি গবেষণাগ্রন্থ; মুনীর চৌধুরীর 'মীর-মানস' এবং মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের 'ভাষাশিল্পী মশাররফ'। প্রথমোক্ত গ্রন্থে মীর মশাররফ হোসেনের মানসপ্রবণতার সূত্র নির্ধারণ ক'রে মূল্যায়ন করা হয়েছে তাঁর সাহিত্যসম্ভার, অন্যটিতে অন্বেষণ করা হয়েছে ভাষাশিল্পী হিসেবে তাঁর সাফল্য। ইতিহাসাশ্রয়ী, বর্ণনাধর্মী এবং পরিচিতি-মূলক সাহিত্যগবেষণার ধারায় 'মীর-মানস' প্রথম আদ্যন্ত মূল্যায়নপ্রবণ গবেষণাগ্রন্থ। এ-গ্রন্থে মুনীর চৌধুরী মূল্যায়নপ্রবণ সাহিত্যগবেষণায় এক নতুন ভাষারীতি প্রয়োগ করলেন; এতে বিন্যস্ত বাক্যরাশি যেমন বিষয়ানুগ, তেমনি সঙ্গীতগুণসমৃদ্ধ এবং শ্রুতিমধুর। "মীর-মানস", "বসন্তকুমারী নাটক", "বিষাদসিন্ধুর পুনর্বিচার" এবং "বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন" শীর্ষক আলোচনা এ-গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ এলাকা। মীর মশাররফ হোসেনের মানসপ্রবণতা এবং তাঁর শিল্পীসত্তা সম্পর্কে মুনীর চৌধুরীর ব্যাখ্যা লক্ষণীয় : "প্রবৃত্তির অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় জর্জরিত মানুষ আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনের যে মহামূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করে, বঙ্কিমের মত মীর মশাররফ হোসেনও প্রথম জীবনে তার রূপকার ছিলেন। প্রেমবহ্নিতে দগ্ধ রেবতীতে (বসন্তকুমারী নাটক) তার উন্মেষ, রূপজ মোহে আত্মবিক্রিত এজিদে (বিষাদসিন্ধু) তার পূর্ণ পরিণতি। মানবী জায়েদার ট্রাজেডীও কম মর্মস্পর্শী নয়। মীরের ধর্মানুভূতিও এই পর্যায়ে উদার, শিল্পীজনোচিত। সামাজিক বিচারবুদ্ধিতে একে অসাম্প্রদায়িক এবং 'সমন্বয়ধর্মী'ও বলা যেতে পারে।"[৭২] 'বিষাদ-সিন্ধু'র পুনর্বিচার প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর বিশিষ্ট মূল্যায়ন অনুধাবনীয় :

> ···মধ্যযুগীয় ধর্মচেতনার জীবনবিমুখ আচ্ছন্নতাকে অপসারিত করে ইহলোকের ইন্দ্রিয়পরবশ মানব-মানবীর হর্ষশোকের মহামূল্যকে তিনি যে কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, সেটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই জন্যই 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রধান চরিত্রসমূহ, কিস্‌সা-কাহিনীর ক্রোড়োদ্‌ভূত হয়েও অনেক দূর পর্যন্ত মৃত্তিকা-সংলগ্ন, প্রিয়-পরিজন-বেষ্টিত, শত্রু-মিত্র পরিবৃত, সজীব নরনারী।[৭৩]

'ভাষাশিল্পী মশাররফ'-গ্রন্থে মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল প্রতিষ্ঠা ক'রতে চেয়েছেন ভাষাশিল্পী হিসেবে মীর মশাররফ হোসেনের বিশিষ্টতা ও সার্থকতা। এতে তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় চিহ্নিত হ'য়ে আছে। গ্রন্থ-রচনা সম্পর্কে গ্রন্থকারের সাধুচলিতের মিশ্রভাষারীতি লক্ষণীয় :

> ···নূতন ও পুরাতন তথ্যের আলোকে মশাররফের রচনার নব মূল্যায়ন করা হইয়াছে ঐ গ্রন্থে। আলোচ্য গ্রন্থ মশাররফের প্রতিভার এক বিশেষ দিককে

উদ্‌ঘাটিত **করিতেছে** সেটি হলো ভাষা শিল্পী হিসাবে মশাররফ। মশাররফের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি **করতে হলে** বাঙলা গদ্যের গোড়ার ইতিহাসটি অবশ্যই জানা প্রয়োজন। সে জন্যই প্রথম অধ্যায়ে আদিযুগের গদ্য রচনার কিছু নমুনা সন্নিবেশিত **হলো**। তারপরই দ্বিতীয় অধ্যায়ে মশাররফের রচনারীতি বা ষ্টাইল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা **হইয়াছে**।[৭৪]

অভিন্ন-সময়ে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) জীবন ও কাব্য বিষয়ে গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে দু'টি। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত আতাউর রহমানের 'নজরুল কাব্য-সমীক্ষা' কবি ও কাব্য প্রসঙ্গে বিবিধ বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধের সমাবেশ। তবে প্রবন্ধসমূহের প্রাসঙ্গিকতা এবং গ্রন্থকারের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি গ্রন্থটিকে দান করেছে সমগ্রতা। রফিকুল ইসলামের 'নজরুল-নির্দেশিকা' আলোচ্য সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এ-গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে নজরুল ইসলামের যাবতীয় রচনার কালানুক্রমিক ও বর্ণানুক্রমিক সূচি, গ্রন্থপঞ্জি ও সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি। কবির সাহিত্যসাধনার প্রামাণিক রচনাপঞ্জির অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার এই দুরূহ সঙ্কলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৭৫] কঠিন শ্রমসাপেক্ষ এ-ধরনের গ্রন্থের ভূমিকা শিক্ষার্থীর কাছে যেমন অভিধান-সদৃশ তেমনি নজরুল-গবেষকের কাছে তা' বিবেচিত হবে তথ্যকোষ রূপে।

এতদ্ব্যতীত, আলোচ্য কালপরিসরে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াবলম্বনে রচিত পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশ লাভ করে। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত আনোয়ার পাশার 'সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল' গ্রন্থে আবুল ফজলের (১৯০৩/১৩১০) দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাহিত্যসাধনার মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ-গ্রন্থ প্রণয়নের পরিকল্পনায় ছিল আবুল ফজলের জীবন ও সাহিত্যের আলোচনা ও সমালোচনা, কিন্তু অনুসন্ধিৎসু গবেষকের সংগৃহীত তথ্য ও তার বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপনা একে গবেষণাগ্রন্থের চারিত্র-অর্জনে সহায়তা করেছে। এ-দেশের সমকালীন কোন সাহিত্যিকের জীবন ও সাহিত্যের মূল্যায়ন-প্রচেষ্টায় এ-গবেষণাকর্ম সম্পাদন ক'রে আনোয়ার পাশা অর্জন করেছেন পথিকৃতের গৌরব। গ্রন্থান্তর্গত প্রথম অধ্যায় "জীবন ও যুগ পরিবেশ" এ-দেশের সাহিত্যগবেষণায় ভবিষ্যৎ-গবেষকদের তথ্য-নির্দেশনায় পালন করবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

একই বছরে প্রকাশিত সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জসীমউদ্‌দীন' গ্রন্থখানি জসীম-উদ্‌দীনের কবিপ্রতিভা, কাব্য, লোকনাট্য ও গদ্যরচনার তথ্য-নির্ভর পরিচয়-দানের প্রয়াস।[৭৬] এতে মূল আলোচনার উন্মোচন ঘটেছে "কবিতায় গ্রামের দিকে সংকেত" শিরোনামায় উপস্থাপিত, বাংলা সাহিত্যে জসীমউদ্‌দীনের স্থান নির্দেশক আলোচনায়। তাঁর ভাষায়: "বাঙলা কাব্যের প্রকৃতি যখন এমনি করে পালটে যাচ্ছিল, বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তা' যখন সাধারণ পাঠক-চিত্তে আবেদন সৃষ্টির স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছিল, দেশের বৃহত্তর জনমানস থেকে তা' যখন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল, তখন 'দূরাগত রাখালের বংশীধ্বনির' ন্যায় জসীমউদ্‌দীনের কবিতা আমাদের পল্লীর মাধুর্যময় রূপের দিকে আকর্ষণ করার প্রয়াস পেয়েছিল।"[৭৭] সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের অপর গ্রন্থ 'কবি ফররুখ আহমদ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে। এতে আলোচিত হয়েছে আধুনিক বাংলা কাব্যের পটভূমিতে ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্যকামী শিল্পচেতনাজাত কাব্যপরিচয়, তাঁর কবিভাষা এবং কবিপ্রতিভার রূপ ও রঙ। ফররুখ আহমদের কাব্যসাধানার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের বিবেচনা দ্রষ্টব্য:

> ফররুখ আহমদের কাব্য-সাধনাকে বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের সাধনা না বলে প্রকৃতপক্ষে বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম জীবনাদর্শ ও ঐতিহ্যের সার্থক

সাহিত্যিক রূপায়ণের চেষ্টা তথা বাঙলার মুসলমানের সাহিত্যিক দৈন্য মোচনের সাধনা বলা উচিত।[৭৮]

একই বছরে প্রকাশিত সন্‌জীদা খাতুনের 'সত্যেন্দ্র-কাব্য পরিচয়' শীর্ষক গ্রন্থখানি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের 'বিশ্বভারতী'র এম. এ. পরীক্ষার গবেষণানিবন্ধ-রূপে রচিত হয়েছিল। 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' শিরোনামায় এটি ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশ লাভ করে। বর্তমান-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সত্যেন্দ্রনাথের জীবন-পরিচয় ও সাহিত্যিক পরিবেশ বর্ণনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সত্যেন্দ্র-কাব্যের বিভিন্ন ভাবধারা, তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে তাঁর রচনাবলীর বিশিষ্টতা, চতুর্থ অধ্যায়ে সমকালীন এবং পূর্বসুরিগণের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের স্থান নির্ণয় করা হয়েছে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাঁর গদ্যরচনার পরিচয়। "সত্যেন্দ্রনাথের গদ্য রচনা" শীর্ষক আলোচনায় গ্রন্থকার তাঁর রচিত নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ এবং পত্র সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। সন্‌জীদা খাতুনের এ-প্রয়াস সত্যেন্দ্র-সাহিত্যের একটি অনালোকিত কক্ষকে সাধারণ্যে আলোকময় ক'রে তুলতে সাহায্য করেছে। এ-প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য লক্ষণীয় :

> অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে পড়তে অনেক সময়েই আমরা তাতে গদ্যধর্মী মননশীলতার পরিচয় পেয়েছি। প্রমথ চৌধুরীর কবিতাতে যেমন—সত্যেন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেও তেমনি 'পদ্যের rhyme' এর সঙ্গে 'গদ্যের reason'—এর মিশ্রণ ঘটেছে। সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-ইতিহাসের আলোচনা-প্রধান কবিতাগুলিতেই এই মিশ্রণ সব চাইতে বেশী দেখা যায়। এই মননশীলতা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে প্রশস্ত পথ পেয়েছিল।[৭৯]

সাহিত্যগবেষণার-ক্ষেত্রে তুলনামূলক সাহিত্যবিবেচনার যে-আদর্শ স্থাপন করেছিলেন সৈয়দ আলী আহসান, তারই পরিণত, শিল্পিত ও সার্থক বিকাশ লক্ষ্য করি মুনীর চৌধুরী-রচিত 'তুলনামূলক সমালোচনা' গ্রন্থে। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক সাহিত্যচিন্তায় পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব"[৮০] মুনীর চৌধুরীর 'তুলনামূলক সমালোচনা' এদেশের সাহিত্যগবেষণায় বিশ্বসাহিত্যর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্কসূত্রকে করেছে উন্মোচিত। এ-গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে পাঁচটি প্রবন্ধ ; এ-গুলির পর্যায়ক্রমিক শিরোনামা হচ্ছে," ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়", "জাঁ রাসিন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ", "পুরুবিক্রম ও আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট", "সরোজিনী ও ইফিজেনিয়া", "মাইকেল ও শেক্সপীয়র" এবং "মহাবৎ খাঁ ও মহীপৎ সিংহ"। তাঁর গ্রন্থে উইলিয়ম শেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) কাব্যপ্রবণতা ও স্বাতন্ত্র্য নির্দেশিত হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যসমূহে :

> মাইকেলের ঋণ সাধারণের কাছে যা স্বপ্রকাশ সেটাই সত্য। মহাকাব্যে মাইকেলের মহাজন মিল্‌টন, নাট্যে শেক্সপীয়র। এই ঋণ মাইকেল গ্রহণ করেছেন ঐশ্বর্যবান শিল্পীর স্বভাবধর্মানুযায়ী। মাইকেল-মানস ছিল ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বিচিত্র রসে পরিপুষ্ট। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের কোন বিশিষ্ট শিল্পীর জীবন-চেতনা ও শিল্পরীতি তাঁর স্বকীয় আন্তর প্রেরণার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তাঁর কল্প-লোককে সংগঠিত করতে সাহায্য করেছে ; তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে সবলয়িত ও সুসমৃদ্ধ করেছে। মাইকেলমানসের ওপর এই সকল প্রভাবের মধ্যে, নাট্য রচনার ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রই ছিল মুখ্য।[৮১]

১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলার সাহিত্যগবেষণা সমকালীন দেশকালের প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যমণ্ডিত; এতে যেমন রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের পরোক্ষ অভিব্যক্তি ঘটেছে, তেমনি গ'ড়ে উঠেছে সত্যসন্ধ গবেষকের নিরাসক্তি, নির্মোহ গবেষণা-পদ্ধতিও। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাপুঞ্জের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার স্বাক্ষর আমরা প্রত্যক্ষ করি ইতিহাসমূলক ও রবীন্দ্রসাহিত্যবিষয়ক গবেষণা-গ্রন্থে। ইতিহাস-প্রণয়ন এবং আধুনিক-সাহিত্য গবেষণা এ-সময়ের গবেষণাকর্মের প্রধান প্রবণতা। লক্ষণীয়, ইতিহাসমূলক বিবরণধর্মী গবেষণার ধারা সময়ের প্রবহমানতায় ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়েছে ক্ষীণস্রোতে, পক্ষান্তরে আধুনিক-সাহিত্যের গবেষণাস্রোত লাভ করেছে গতিময়তা। অর্থাৎ পরিচিতি আলোচনা-বিবরণ ও বিবৃতির স্থল অধিকার করেছে মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ ও বিবেচনা। ঐতিহ্যসন্ধান ও স্বাজাত্যানুরাগের পরিবর্তে এ-পর্যায়ের গবেষকরা অঙ্গীকার করেছেন সমকাল ও সমকালীন সাহিত্য। এই বেগবান গবেষণা-প্রবাহই নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের (১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১) সাহিত্যগবেষণার মুখ্য-প্রবণতার নির্দেশক।

বাংলাদেশে সাহিত্যগবেষণা

১৯৭১—১৯৮২

দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের পর ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের। বলা আবশ্যক, বাঙালির এই স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল অনুপ্রেরণা ছিল ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ; নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্যস্তম্ভ হিসেবে ঘোষিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা, জাতীয় সংগ্রামের মূল অনুপ্রেরণার অবমূল্যায়ন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজসংগঠনের স্তরবহুলজটিলতা, অর্জিত ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অস্থিতিশীল প্রশাসন, নাগরিকত্ব ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, সমাজতন্ত্র-বিমুখতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ক্ষমতার ক্রমভঙ্গুর পরিবর্তন ইত্যাদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর এক দশকের সমাজচৈতন্যকে আশা-নিরাশার ঘূর্ণাবর্তে করেছে নিক্ষিপ্ত।

অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অস্থিরতাজাত সমাজমানসের এই দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ-চৈতন্য এবং তার থেকে মুক্তির অন্বেষা এ-কালের সাহিত্যগবেষণায় ততটা অভিব্যক্ত নয়। জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়-ঐতিহ্য প্রশ্নে দ্বন্দ্বমুক্তির প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ করি এ-সময়ের সাহিত্য-গবেষণায়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণা সূচনাকাল থেকেই পাকিস্তান-শাসিত পূর্ব-বাংলার ষাটের দশকের মূল্যায়নপ্রবণ গবেষণাপদ্ধতির উত্তরাধিকারকে প্রতিজ্ঞা ক'রে নেয়। এই এক দশকে নিষ্পন্ন গবেষণায় প্রধানতঃ অঙ্গীকৃত হয়েছে আধুনিক-সাহিত্য। এই আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়নপ্রবণ গবেষণাস্রোতই এ-কালে অর্জন করেছে প্রাধান্য এবং মধ্যযুগের সাহিত্য, সাহিত্যের ইতিহাস এবং লোকসাহিত্য-বিষয়ক গবেষণাস্রোত ধারণ করেছে ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু আকার। তবে, এ-প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক, উল্লিখিত সময়ে উভয় স্রোতেই সম্পন্ন হয়েছে প্রতিনিধিত্বশীল গবেষণা। লক্ষণীয় এ-কালের প্রধান গবেষকরা স্বাজাত্যানুরাগ, ঐতিহ্যমুগ্ধতা এবং সীমাবদ্ধ জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে অঙ্গীকার করেছেন আন্তর্জাতিকতা তথা বিশ্বজনীনতা। ফলতঃ, এ-সময়ে ইতিহাসের ধারা-বর্ণনার স্থল অধিকার করেছে সমাজতাত্ত্বিক ও নন্দনতাত্ত্বিক সাহিত্য-গবেষণা। পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলার প্রধান গবেষকরা ছিলেন আদর্শমুগ্ধতায় অন্ধ, শাসক-পরিতোষণে আত্মবিস্মৃত; আর নবপ্রতিষ্ঠ বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষকরা স্বার্থান্ধ-তার স্থলে অঙ্গীকার করলেন মূল্যায়ন-আশ্রয়ী সত্যসন্ধান।

১৯৭২ থেকে ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দ সময়-পরিসরে বাংলাদেশ গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে একত্রিশটি।[৮২] আলোচনার সুবিধার্থে আমরা গ্রন্থসমূহের নিম্নরূপ শ্রেণীকরণ করেছি : [ক] ইতিহাসমূলক গবেষণা : নীলিমা ইব্রাহিমের 'বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা' (১৯৭২), শামসুল হকের (১৯২৮) 'বাংলা সাময়িক পত্র' (১৯৭৩), মনসুর মুসার (১৯৪৫) 'পূর্ব বাঙলার উপন্যাস' (১৯৭৪), মুস্তাফা নূরউল ইসলামের 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত' (১৯৭৭), আহমদ শরীফের 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' (১৯৭৮), আবুল কাসেম ফজলুল হকের (১৯৪৪) 'উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য' (১৯৭৯), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত' (১৯৮১) এবং আবুল কাশেম চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্‌শা : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা (১৯৮২)। [খ] সাহিত্যগবেষণা : মধ্যযুগ : আহমদ শরীফের 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ' (১৯৭৭) এবং আবদুল হাফিজের 'বাংলা রোমান্স-কাব্য পরিচয়' (১৯৭৬)। [গ] লোকসাহিত্য-গবেষণা : ওয়াকিল আহমদের 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি' (উপস্থাপনকাল ১৯৭২, প্রকাশকাল ১৯৭৪), আবুল আহসান চৌধুরী 'কুষ্টিয়ার বাউল সাধক' (১৯৭৪) এবং আনোয়ারুল করিমের 'ফকির লালন শাহ' (১৯৭৬)। [ঘ] গবেষণা-মূলক প্রবন্ধসঙ্কলন : আবদুল মান্নান সৈয়দের (১৯৪৩) 'শুদ্ধতম কবি' (১৯৭২), আবু হেনা মোস্তফা কামালের (১৯৩৬) 'শিল্পীর রূপান্তর' (১৯৭৫), আনিসুজ্জামানের 'স্বরূপের সন্ধানে' (১৯৭৬) এবং আবদুল মান্নান সৈয়দের 'দশ দিগন্তের দ্রষ্টা' (১৯৮০)। [ঙ] আধুনিক-সাহিত্য গবেষণা : রফিকুল ইসলামের 'নজরুল জীবনী' (১৯৭২), মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের 'মীর মশাররফের গদ্যরচনা' (১৯৭৫), আবদুল কাদিরের (১৯০৬) 'কাজী আবদুল ওদুদ' (১৯৭৬), বেগম আক্তার কামালের 'বিষ্ণুদের কাব্য : পুরাণ প্রসঙ্গ' (১৯৭৭), মুহম্মদ মজির উদ্দীনের 'রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশচেতনা' (১৯৭৮), নাজমা জেসমিন চৌধুরীর 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি' (১৯৮০), সৈয়দ আকরম হোসেনের 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ' (১৯৮১), সিদ্দিকা মাহমুদার 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা : চেতনা ও চিত্রকল্প' (১৯৮১), সন্‌জীদা খাতুনের 'রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ' (১৯৮১), সৈয়দ আবুল মকসুদের 'সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য' (১৯৮১), রফিকুল ইসলামের 'কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা' (১৯৮২), গোলাম মুরশিদের 'রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ : পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা' (১৯৮২) এবং মোরশেদ শফিউল হাসানের 'বেগম রোকেয়া : সময় ও সাহিত্য' (১৯৮২)। [চ] সাহিত্য গবেষণা-প্রসঙ্গ : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা' (১৯৭৮)।

[ক] ইতিহাসমূলক গবেষণা

১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত নীলিমা ইব্রাহিমের 'বাংলা নাটক উৎস ও ধারা', উন্মেষ-যুগ থেকে বিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত কালসীমায় রচিত বাংলা নাটকের ধারাবাহিক ইতিহাস। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার বাংলা নাটকের উদ্ভবে ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রিক পটভূমির সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। তিনি চর্যাগানে ডোম্বী ও বাপুড়ীর নৃত্য ও গীতের রাগরাগিণী এবং বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে, এদেশে হাজার বছরের নৃত্য ও সঙ্গীত-কলা এবং অভিনয়-শিল্পের ঐতিহ্য ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে উনিশ শতকের পথিকৃৎ নাট্যকার থেকে শুরু ক'রে বিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত বিস্তৃত নবীন-নাট্যকারদের নাট্যপ্রতিভা ও মঞ্চায়ন-উপযোগী নাটকের মূল্যায়নধর্মী পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ-গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রে সমগ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসরচনায় নীলিমা ইব্রাহিম এ-দেশে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন।

শামসুল হক প্রণীত 'বাংলা সাময়িক পত্র', ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালসীমায় এ-দেশে প্রকাশিত পাঁচশটি সাময়িকপত্রের পরিচিতি-সঙ্কলন। আনিসুজ্জামান-রচিত 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র' গ্রন্থের সংযোজন হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতঃ এ-দু'টি গ্রন্থ পরস্পরের পরিপূরক হ'য়ে রচনা করেছে এদেশের সাময়িকপত্রের ইতিহাসের রূপরেখা। এ-প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক, ১৯৩১ থেকে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এদেশের সাময়িকপত্রের ইতিহাস বর্তমানাবধি অলিখিত। ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মুস্তাফা নূরউল ইসলামের 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত' গ্রন্থের উপজীব্য বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের "মুসলমান সম্পাদিত" সাময়িকপত্রিকা। ঐ-সময়কালের সাময়িকপত্রের পরিচয় আনিসুজ্জামান-রচিত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, বর্তমান গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হল, এতে ঐ তিন দশকের সাময়িকপত্রে অভিব্যক্ত জীবন ও জনমত তথা শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, রাজ-নীতি, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি প্রসঙ্গে কালানুক্রমিক ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলার তেইশ বছরে রচিত বাঙালি ঔপন্যাসিকের রচনার পরিচয় এবং সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন-প্রয়াসে মুনসুর মুসার 'পূর্ব বাঙলার উপন্যাস' গ্রন্থটি রচিত। ঔপন্যাসিকের জন্মের কালানুক্রম অনুসারে বিন্যস্ত এ-গ্রন্থের চারিত্র অনেকটা ইতিহাসমূলক; তাই এতে পরিচয় মুখ্য, বিশ্লেষণ গৌণ। ঐ-তেইশ বছরে রচিত উপন্যাসের পরিচয়-উপস্থাপনা এ-গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

আহমদ শরীফের 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' উদ্ভব-যুগ থেকে মধ্যযুগের পনেরো শতক-অবধি রচিত বাংলা সাহিত্যের বিশ্লেষণাত্মক ইতিহাস। সাহিত্যের অধ্যাপক ও গবেষক হিসেবে তাঁর দীর্ঘ দিনের "সঞ্চিত জ্ঞান, উপলব্ধ তত্ত্ব, লব্ধ প্রজ্ঞা, অর্জিত বোধি এবং তজ্জাত প্রত্যয়গুলো"[৮৩] লিপিবদ্ধ হয়েছে বর্তমান-গ্রন্থে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত মতের খণ্ডন এবং নতুন সূত্র আবিষ্কার। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালির জাতিসত্তার স্বরূপ নির্ণয় এবং সাহিত্যে তার চিত্তের প্রতিফলন বিশ্লেষণ বর্তমান গ্রন্থের আকর্ষণ-বিন্দু। স্বভাবতঃই গ্রন্থকার এতে স্বাধীনভাবে নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তিবিন্যাস করেছেন, এবং সমন্বিত করেছেন প্রতিপাদ্য ও প্রমাণ। ঐতিহাসিকের বলিষ্ঠতা এবং পথ-রচনার ক্ষেত্রে শ্রমকঠিন আত্মশক্তির পরিচয় আহমদ শরীফের এ-গ্রন্থের সহজলক্ষ্য বিশিষ্টতা। গ্রন্থের "নিবেদন"-অংশে ব্যক্ত তাঁর বক্তব্য এক্ষেত্রে অনুধাবনীয়: এ গ্রন্থস্থ যে সব তথ্য ও সিদ্ধান্ত, মত ও মন্তব্য নতুন, সেগুলো আমার। আমার কোন কোন মন্তব্যে ও সিদ্ধান্তে তথ্য-প্রমাণের তেমন স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ সমর্থন নেই বটে; তবু সেগুলো জিজ্ঞাসু ও সন্ধিৎসু তথ্য উদ্‌ঘাটনে ও সত্য উদ্ধারে প্রবর্তনা দেবে—এমনি এক প্রত্যাশাপ্রসূত। তাছাড়া, ব্যক্তিক চিন্তা-চেতনা যেহেতু ব্যক্তির দেশ, কাল ও অবস্থানসঞ্জাত, সেহেতু তথ্যমাত্রই তত্ত্বজাত ও তত্ত্বপ্রসূ। তাই নিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনায় বা ব্যাখ্যা-বিচারে মন-মতের অভিব্যক্তি দান কিংবা ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। আপেক্ষি-কতার সে-দোষ এ বইতেও রইল। অন্যসব তথ্য ও সিদ্ধান্তের জন্যে আমি উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত-নাম বিদ্বানদের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।"[৮৪]

'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রথম অধ্যায়ের প্রধান আলোচিত বাঙালির ভৌগোলিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, "বাঙলা সাহিত্যের আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীরূপ", "বাঙলার রাজনীতিক ইতিকথা" এবং "মধ্যযুগে জাতিবৈর ও তার স্বরূপ"। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রধানতঃ বিশ্লেষণ করা হয়েছে বাঙালির মৌলধর্ম, সন্ধান করা হয়েছে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস, পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে

"বাঙলা সাহিত্যের তথাকথিত আঁধার যুগ" প্রসঙ্গ এবং উপস্থাপিত হয়েছে রাজনৈতিক 'উত্থানপতন-ভিত্তিক বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ। তৃতীয় অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয় চর্যা-গীতি, আর চতুর্থ অধ্যায়ের বিশ্লেষণের বিষয় পনেরো শতক পর্যন্ত চর্যাপদ-পরবর্তী কবি ও কাব্য। বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' সম্পর্কে বিভিন্ন প্রমাণ ও যুক্তি বিন্যাস ক'রে আহমদ শরীফ এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "...বাঙলা বারো, তেরো ও চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগ অবধি লেখ্যভাষার স্তরে উন্নীত হয় নি। এটি হচ্ছে বাঙলার স্বীকার প্রাপ্তির কাল ও মৌখিক রচনার যুগ।"[৮৫] 'মনসা মঙ্গল' প্রসঙ্গে তাঁর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন বর্তমান গ্রন্থের বিশিষ্ট সংযোজন। তাঁর মূল্যায়নপদ্ধতি ও ভাষারীতি লক্ষণীয় :

> ...আমি চাঁদ বেহুলার কথা বলছি। তেত্রিশ কোটি দেবতার অনুগত বাঙালী সন্তান চাঁদ বলে---আমি শিবের উপাসক, ঐ একজনকে ছাড়া অন্য কাউকে—নারী দেবতাকে পূজো করব না—'যেই হাতে পূজি আমি দেব শূলপাণি।/ সেই হাতে পূজব আমি চেঙমুড়ি কানি?—কখনো না, কোন অবস্থাতেই না, বরং মরব, তবু ঐ দেবীর পূজা করব না'। যেই কথা সেই কাজ। আবার মাঠে বাটে ঘুরে বেড়ানো মেয়ে, নিতান্ত নিরক্ষরে গেঁয়ো গেরস্তের মেয়ে—বিয়ে কি তা-ই বুঝবার বয়স ছিল না তার, সেই বালিকা সন্ধ্যায় বধূ হয়ে ঢুকল বাসরে, আর সকালে পাকা গিন্নির মতো যেন বলে—আমি মানিনা, আমার জীবন-যৌবন-দাম্পত্য ব্যর্থ করে দেবার অধিকার কারুর নেই, সৃষ্টিরও নেই, স্রষ্টারও নেই। আমি এ মৃত্যু স্বীকার করিনে। এ সদ্য বিধবার শোকোচ্ছ্বাস নয়, এ এক সংকল্পে দৃঢ়া দৃপ্তা নারীর বিশ্বজগতের অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ। ...মনসামঙ্গলের কাহিনী দেব-মানবের সংগ্রামের কাহিনী। সে-সংগ্রামে সন্ধি হয়েছে, মানবভাগ্য পরাজয়ের গ্লানি বহন করেনি। দেবতার মান-মর্যাদাও বজায় রয়েছে, আবার মনুষ্যত্বও হয়েছে মহিমান্বিত।[৮৬]

আবুল কাসেম ফজলুল হকের 'উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য', গ্রন্থের অন্তর্গত বিষয় ও বক্তব্য অভিনব না হলেও, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও তার রচিত সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণায় তিনিই প্রথম অভিযাত্রী। গ্রন্থকার শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের স্বরূপ উন্মোচন ক'রে শ্রেণীর 'প্রতিনিধিত্বকারী' সাহিত্যের বিশ্লেষণ-প্রয়াসী হয়েছেন। এ-গবেষণাকর্মে সমাজ ও সাহিত্য বিশ্লেষণে গবেষকের অনুসৃত বিশিষ্ট মতবাদ প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলতঃ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে তিনি উনিশ শতকের নবোদ্ভূত মধ্যশ্রেণীর সাহিত্যরচনার পটভূমি, সে-শ্রেণী ও সাহিত্যের বিকাশ এবং সম্ভাব্য পরিণাম নির্দেশ করেছেন। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের শ্রেণীরূপ নির্দেশে তাঁর বক্তব্য লক্ষণীয় :

> বস্তুত ইংরেজ আমলে মধ্যশ্রেণীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি প্রতিটি বিকাশের সঙ্গে সমান তালে বিকশিত হয়েছে আধুনিক বাঙলা সাহিত্য। লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, আধুনিক বাঙলা সাহিত্য আধুনিক যুগের সকল বাঙালীর সাহিত্য নয়, এই সাহিত্য একান্তভাবেই পূর্বোক্ত মধ্যশ্রেণীর সাহিত্য।[৮৭]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান রচিত 'সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত' গ্রন্থে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন-সম্পাদিত মাসিক 'সওগাত' (১৯১৮) পত্রিকায় বিধৃত সাহিত্যচিন্তার পরিচয় উপস্থাপন এবং এর প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যা থেকে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের 'সওগাত' গ্রন্থটির আলোচনার পরিধি। গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে উপর্যুক্ত কালপরিসরে ঐ-পত্রিকায় প্রতিফলিত

সাহিত্যচিন্তার নিম্নরূপ শ্রেণীকরণ করেছেন: "বাংলা সাহিত্য: প্রাচীন ও মধ্যযুগ", "বাংলা সাহিত্য: আধুনিক যুগ", "বিশ্বসাহিত্য", "ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব", "সাহিত্য-সম্মেলন: অভিভাষণ", "গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সমালোচনা"। এ-জাতীয় গবেষণাকর্মের গ্রন্থনা শ্রমকঠিন অধ্যবসায় সাপেক্ষ। ব্রিটিশশাসিত পূর্ব-বাংলার বাঙালির সাহিত্যসাধনা, তাঁদের বোধি ও বিবেচনার স্বাক্ষর এতে সঙ্কলিত হয়েছে। বাঙালির মেধা, মনন ও চেতনার ব্যাখ্যা-সম্বলিত এ-পরিচিতি, এ-দেশের সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাস প্রণয়নে হবে সহায়ক।

আবুল কাশেম চৌধুরী 'বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্শা: পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা' ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রদত্ত পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য লিখিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভ। ১৮২০ থেকে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালপরিধিতে রচিত বাংলা-সাহিত্যের সামাজিক নক্শার পটভূমি পর্যবেক্ষণ এবং এর প্রতিষ্ঠার বিশ্লেষণ বর্তমান-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। সাহিত্যগবেষণায় উনিশ শতকের সামাজিক নক্শাকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রয়াস বিরল, আবুল কাশেম চৌধুরীর এ-গবেষণাকর্ম তাই বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণায় মূল্যবান সংযোজন। পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ-গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বিবেচনার স্বাক্ষর বর্তমান; বিশেষতঃ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে স্থাপিত যথাক্রমে "সামাজিক নক্শার পটভূমি", "রক্ষণশীল পরিবেশ: সামাজিক নক্শার সম্ভাবনা", "রক্ষণশীল পরিবেশ ও নক্শার প্রতিষ্ঠা: ভবানীচরণের যুগ" শীর্ষক সমাজতাত্ত্বিক-সাহিত্যিক পর্যালোচনা একে করেছে গৌরবান্বিত।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের ইতিহাসমূলক গবেষণায় পরিত্যাজ্য হয়েছে বিবরণ-সর্বস্বতা, গৃহীত হয়েছে বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন। পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলার এ-ধারার সাহিত্যগবেষণায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ঐতিহ্যমুগ্ধ গবেষকদের ঐতিহ্যসন্ধান; তাঁদের মোহগ্রস্ত শ্রদ্ধাবোধ সেখানে বিচলিত করেছে সাহিত্যবিবেচনাকে। এ-কালের ইতিহাসমূলক গবেষণা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ধারার এবং সমগ্র বাংলা-সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচনে হয়েছে প্রয়াসী।

[খ] সাহিত্যগবেষণা : মধ্যযুগ

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মধ্যযুগের সাহিত্যভিত্তিক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে দু'টি। ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ লাভ করে আবদুল হাফিজের 'বাংলা রোমান্স-কাব্য পরিচয়'; এতে রোম্যান্সমূলক প্রণয়কাব্যের বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক-পদ্ধতিতে হয়েছে সন্নিবিষ্ট।[৮৮] কিন্তু গ্রন্থটির শিরোনামা সমগ্রতাসন্ধানী হ'লেও, আলাওল, দৌলত উজির বাহ-রাম খান, দৌলত কাজী এবং মুহম্মদ কবিরের প্রণয়কাব্যই শুধু আলোচনাভুক্ত হয়েছে। আহমদ শরীফের 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ' গ্রন্থে মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রতিফলিত সে-যুগের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়-প্রদানের উদ্দেশ্যে নীতিশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ এবং রোম্যান্সমূলক প্রণয়কাব্য থেকে "...জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত তথ্য ও তত্ত্ব"[৮৯] সঙ্কলিত হয়েছে। আহমদ শরীফের এ-গ্রন্থনা মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সঙ্কলনের প্রথম পদক্ষেপ। এ-গ্রন্থের প্রথম চারটি পরি-চ্ছেদে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি প্রসঙ্গ সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত হয়েছে; তাঁর বিশ্লেষিত ঐ-পাঁচটি প্রসঙ্গ হচ্ছে: "সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ-বিবর্তন ধারা", "বাঙলার মৌল ধর্ম", "বাঙলায় সূফীপ্রভাব", "বাঙলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ" এবং "মধ্য-যুগে জাতিবৈর ও তার স্বরূপ"।

এই এক দশকে মধ্যযুগের সাহিত্যভিত্তিক গবেষণাগ্রন্থের স্বল্পতা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ঐ-ধারার সাহিত্যগবেষণায় অনাগ্রহকেই প্রতিফলিত করে। পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলায় ইতিহাসমূলক গবেষণাধারার পাশাপাশি মধ্যযুগের সাহিত্যভিত্তিক গবেষণা-কর্মও অর্জন করেছিল প্রাধান্য। কিন্তু আলোচ্য কালের গবেষকরা মধ্যযুগের প্রতি আকৃষ্ট নন; তাঁদের আগ্রহ পরিস্ফুট হতে দেখি আধুনিকসাহিত্য গবেষণায়।

[গ] লোকসাহিত্য-গবেষণা

ওয়াকিল আহমদের 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি' ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রিপ্রাপ্ত গবেষণা-অভিসন্দর্ভ 'বাংলার লোকসাহিত্যে লোকসংস্কৃতির উপাদান' এর গ্রন্থরূপ। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করে ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে। গ্রন্থের উপজীব্য বাঙালি মুসলমানসমাজের লোকসংস্কৃতি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ।[৯০] এর 'ভূমিকা' শীর্ষক অধ্যায়ে সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার লোকসংস্কৃতির উৎস ও বিকাশের ধারা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানস-সংস্কৃতির উপকরণ হিসেবে চিত্র ও নক্‌শা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ হয়েছে মূল্যবান আলোচনা। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে "লোক নৃত্য" ও "লোকবাদ্যযন্ত্র" সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংযোজন পঞ্চম অধ্যায়ে সঙ্কলিত লোকাচার এবং তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আলোচনা। সপ্তম অধ্যায়-অন্তর্গত লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাস-বিষয়ক আলোচনা লোকাচার-বিষয়ক আলোচনারই পরিপূরক। সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং তার প্রগতিশীলতা সম্পর্কে গবেষকের বক্তব্য অনুধাবনীয়:

> ঐতিহ্য ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব নয়। দীর্ঘদিনের জীবনচর্যার নিয়ম ও জীবনচর্চার ফসল একত্রে সংস্কৃতির বুনিয়াদ গড়ে তোলে। সংস্কৃতি ঐতিহ্যবাহী কিন্তু ঐতিহ্যনিষ্ঠ নয়। ঐতিহ্যের অনেক উপকরণ সংস্কৃতির মধ্যে সঞ্চরমান, কিন্তু সব উপাদানই বিরাজমান নয়। ক্রমোৎকর্ষ বৈশিষ্ট্যের গুণে সংস্কৃতি যখন রূপান্তরিত ও বিবর্তিত হতে থাকে তখন জীবনযাত্রার প্রতিকূলে ঐতিহ্যের যে অংশ অচল হয়ে দাঁড়ায়, যুগধর্ম ও জীবনধর্মের তাগিদেই তা স্খলিত হয়ে পড়ে যায়। নতুনের স্বচ্ছন্দতায় পুরাতনের বন্ধন ছিন্ন হয়। এ অর্থেই সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী হলে চলে না। অচল অতীত-প্রীতি সংস্কৃতির মৃত্যুর কারণ। জীবন সংস্কৃতির মূল থাকে ঐতিহ্যের মর্মতলে কিন্তু গতানুগতিক অনুবর্তন উপেক্ষা করে ক্রমবিবর্তন-ধারায় প্রগতিশীল হয়ে উঠে।[৯১]

ওয়াকিল আহমদ তাঁর এ-গ্রন্থে লোকবিজ্ঞানীর গবেষণা-পদ্ধতি ছাড়াও বাংলার লোক-সংস্কৃতি বিশ্লেষণে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যুক্ত করেছেন। এতে উপস্থাপিত এবং সঙ্কলিত বিভিন্ন উপাদান ভবিষ্যৎ লোকসংস্কৃতির গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আবুল আহসান চৌধুরীর 'কুষ্টিয়ার বাউল সাধক' ঐ-অঞ্চলের বাউল-সাধনার পরিচিতি-গ্রন্থ। এতে কুষ্টিয়ার পঞ্চান্নজন বাউল-সাধকের পরিচয় এবং সে-সঙ্গে তাঁদের রচনা সঙ্কলন ক'রে গ্রন্থকার লোকসাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে পালন করেছেন বিশিষ্ট ভূমিকা। এর প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে "বাউল ধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধারা", "কুষ্টিয়ার লোকসংস্কৃতি: বাউলগান" এবং "রবীন্দ্রনাথ ও কুষ্টিয়ার বাউল সম্প্রদায়"। এতদ্ব্যতীত "কতিপয় সখের বাউল" শিরোনামায় আলোচিত হয়েছে মীর (শাররফ হোসেন, প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, দাদ আলী (১৮৫৬-১৯২৭), শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ম১৮৬০-১৯১৩) এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়'র (১৮৬১-১৯৩০) জীবন ও সাধনার

পরিচয়। গ্রন্থকার লালন শাহের ধর্ম ও জন্মস্থান নির্ণয়ে প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন ক'রে বিচার-প্রয়াসী হয়েছেন। তবে যুক্তিখণ্ডনে তাঁর নিম্নরূপ উত্তেজনাপ্রসূত বাক্যবিন্যাস সাহিত্যগবেষণার নির্মোহ-নিরাসক্ত চারিত্রকে ক্ষুণ্ন করেছে :

> আবু তালিব সাহেবই কেবল সত্য আবিষ্কার ও প্রচারের ঠিকে পেয়েছেন এবং সঠিক ব্যাখ্যাদানের জন্য নিযুক্ত একমাত্র ব্যক্তি। নিজেকে একক লালন-বিশেষজ্ঞ হিসেবে ঘোষণা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। ···এ বিষয়ে খোঃ রফীউদ্দীন তাঁর উপদেষ্টা এবং খোঃ রিয়াজুল হক (উভয়েই হরিশপুরের অধিবাসী) তাঁর মতের অনুগত প্রচারক। এস. এম. লুৎফর রহমানকেও তালিব সাহেব যোগ্যসহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন। তবে বর্তমানে খোঃ রিয়াজুল হকই তাঁর অন্ধ-অনুসারী ও যথার্থ ভাবশিষ্য।[৯২]

'ফকির লালন শাহ' লালনের জীবন, দর্শন ও সাহিত্যের গবেষক আনোয়ারুল করিমের ক্ষুদ্রকায় গবেষণাগ্রন্থ। এর বিষয়সূচির মধ্যে "লালন শাহ : জীবনী সংক্রান্ত সমস্যা", "লালনের কবিমানস" এবং "রবীন্দ্রনাথ ও লালন শাহ" উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে লোকসাহিত্য-গবেষণার স্বল্পতা নৈরাশ্যসূচক। যে-কোন দেশের লোকসাহিত্য তার সামাজিক ইতিহাসের বিশ্বস্ত উপাদান ; এতে বিধৃত জীবন ও চেতনা জাতির সাংস্কৃতিক চৈতন্যের ক্রমবিকাশের ধারা অনুধাবনে তাৎপর্যবহ। বাঙালির সম্পূর্ণাবয়ব সামাজিক-ইতিহাস রচনার পূর্বশর্ত হিসেবে লোকসাহিত্য-গবেষণার ব্যাপক প্রসার বাঞ্ছনীয়।

[ঘ] গবেষণামূলক প্রবন্ধসঙ্কলন

আলোচ্য দশকে প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধসঙ্কলনের সংখ্যা চার। এ-জাতীয় সঙ্কলন-গ্রন্থের সীমাবদ্ধতা হ'ল—এতে স্থাপিত প্রবন্ধগুচ্ছ বিষয়ের বিভিন্নতার কারণে ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে না। এ-ছাড়াও স্বল্পপরিসরে ব্যক্ত হয় ব'লে এর অন্তর্গত বিষয় এবং প্রবন্ধকারের বক্তব্যের রূপরেখা নির্দেশিত হয় মাত্র ; বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের সমবায়ে পরিপূর্ণ স্বরূপ আবিষ্কৃত হয় না। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত আবদুল মান্নান সৈয়দের 'শুদ্ধতম কবি' এ-ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম প্রকাশনা। এর অন্তর্গত গবেষণা-মূলক "নিবন্ধবৃত্তে"র প্রতিটি নিবন্ধে গ্রন্থকার জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কবিতার রূপনির্মাণ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করেছেন।[৯৩] বিষয়ের অখণ্ডতার কারণে তাঁর এ-গ্রন্থ অর্জন করেছে স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এতে জীবনানন্দের জীবনবোধ, তাঁর কবিতার রূপ ও রস, চিত্র ও চেতনা এবং রূপনির্মাণরহস্য অভিনব শব্দসংগ্রহী ভাষারীতিতে বিবেচিত হয়েছে। জীবনানন্দের কবিতার শুদ্ধতার সূত্র-নির্দেশ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যা ও ভাষারীতি দ্রষ্টব্য :

> বক্ষ্যমাণ শারীরপন্থী আলোচনা-চক্রেও শুদ্ধতার সূত্র সর্বাধিক প্রযোজ্য জীবনা-নন্দ দাশ সম্বন্ধেই : শুধুমাত্র কবিতা ও কবিতা বিষয়ক ভাবনা-বেদনায় নিবেদিত এই কবি যেন কবিতাসুন্দরীর কাছেই আপাদমাথা বিক্রয় ক'রে ব'সে আছেন। এবং সেই হৃদয়োত্থ কবিতায় এমন স্বাদ ফ'লে-ফুটে উঠলো যা "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্যের মতোই 'অভিনব' কিরীট প'রে নিতে পারতো মাথায়। অভিনব ; কেননা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত, বা এমনকি ঠাকুরোত্তর সেই প্রথম তিন নিরুপম ব্রিজ—মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-নজরুল পর্যন্ত—কবিতার শাস্ত্রানুমোদিত আচরণই তৈরি হয়েছে : যেমন প্রসঙ্গে, তেমনি প্রয়োগে।[৯৪]

আবদুল মান্নান সৈয়দের অপর গবেষণামূলক প্রবন্ধসঙ্কলন 'দশ দিগন্তের দ্রষ্টা' প্রকাশিত হয় ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে। গ্রন্থকার-কথিত বাংলাসাহিত্যের প্রধান দশজন কবি—যাঁরা অভিহিত হয়েছেন 'দশ দিগন্তের দ্রষ্টা' হিসেবে, তাঁদের কবিপ্রতিভার মূল্যায়ন এবং কবিতার দিগন্তকে আলোকিত করার প্রয়াসেই এ-সঙ্কলনের গ্রন্থনা। উনিশ থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশকের কালসীমার মধ্যে পরিকল্পিত বাংলাসাহিত্যের প্রধান দশজন কবির কাব্যবিবেচনার এই 'ইতিহাসে' প্রবন্ধগুলি কালভঙ্গুররীতিতে হয়েছে বিন্যস্ত। গ্রন্থে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুচ্ছের ক্রম নিম্নরূপ: "মাইকেল মধুসূদনদত্ত: বহে জলবতী নদী", "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: অনাবশ্যকের কবি। অচিন ঘরের বউ", যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত: রুদ্র নৃত্যের ঝংকার", "মোহিতলাল মজুমদার: এক কাননের বৈতালিক", "নজরুল ইসলাম: কেন বড়োকবি", "বুদ্ধদেব বসু: প্রকৃতি ও সংস্কৃতি", "সুধীন্দ্রনাথ দত্ত: কালো সূর্যের নিচে বহ্ন্যুৎসব", "অমিয় চক্রবর্তী: ঈশ্বরিত মানুষের কথা", "বিষ্ণু দে: ঘরে ফেরা। দামিনী", "জীবনানন্দ দাশ: ছন্দ"।

আবু হেনা মোস্তফা কামালের গবেষণামূলক প্রবন্ধসঙ্কলন 'শিল্পীর রূপান্তর' প্রকাশ লাভ করে ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে; গ্রন্থভুক্ত আটটি প্রবন্ধের ছ'টির উপজীব্য আধুনিক বাংলা-সাহিত্য, অপর দু'টির অবলম্বন উনিশ শতকের দুই বাঙালি প্রতিভার পরস্পর সম্পর্কের পরিচয়। এতে বিন্যস্ত প্রবন্ধসমূহের শিরোনামা হ'ল: "নতুন জীবন: নতুন সংস্কৃতি", "ভবানীচরণ ও কলিকাতা কমলালয়", "বিদ্যাসাগর ও মাইকেল", "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য", "রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা ও পুনশ্চ", "নজরুল-কাব্যে শব্দ-ব্যবহার", "পদ্মা-নদীর দ্বিতীয় মাঝি" এবং "জসীমউদ্‌দীনের কবিতা: জীবন ও শিল্প"। আধুনিক-সাহিত্য বিষয়ক ছ'টি প্রবন্ধেই বিশিষ্ট ভাষারীতিতে বাংলাসাহিত্যের প্রধান রূপকারদের সাধনার মূল্যায়ন উপস্থাপিত হয়েছে। এ-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত-পরিসরে আধুনিক-সাহিত্যের বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্যবিবেচনায় আবু হেনা মোস্তফা কামাল তাঁর বিশিষ্ট মূল্যায়ন-প্রবণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। "নতুন জীবন: নতুন সংস্কৃতি"-প্রবন্ধে আমরা লক্ষ্য করি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাঁর বিশিষ্টতা। গ্রন্থকারের স্বতন্ত্র ভাষাশ্রয়ী মূল্যায়নপ্রক্রিয়ার উদাহরণ নিম্নোদ্ধৃত স্তবকদ্বয়ে লক্ষণীয়:

[ক] "যে আত্মস্বাতন্ত্র্য ও পুরুষকার আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রাবণ-চরিত্রে প্রথম প্রচণ্ড অভিব্যক্তি পেলো, তার উন্মেষ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেই। সুন্দ-উপসুন্দ চরিত্রের ভেতরে বিদ্রোহের যে সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল, রাবণ চরিত্রে তারই পূর্ণতর বিকাশ।"[৯৫]

[খ] "...কেবল ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির সংযোজনে যে সঙ্গীত জেগে ওঠে তার অর্থ প্রাত্যহিক জীবনের বস্তু-সংলগ্ন শব্দের সীমাবদ্ধ প্রতীককে ছাড়িয়ে যায় বলেই তা কবিতা। নজরুলের সার্থক কবিতাগুলিতে এই সজাগতা লক্ষণীয়। তাঁর কাব্যরীতির, শব্দ-ব্যবহারের ব্যর্থতা সেখানেই যেখানে তিনি বক্তব্য প্রকাশের প্রবল গরজে শব্দের সীমাবদ্ধ অর্থকে স্বেচ্ছায় চূর্ণ করেন নি।"[৯৬]

১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ লাভ করে আনিসুজ্জামানের গবেষণামূলক প্রবন্ধসঙ্কলন 'স্বরূপের সন্ধানে'। নিরাবেগী ভাষা ও নির্মোহ-নিরাসক্ত বিশ্লেষণের বিশিষ্টতায় তাঁর এ-গ্রন্থ এদেশের সাহিত্যগবেষণায় স্থাপন করেছে স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত। গ্রন্থান্তর্গত প্রবন্ধসমূহ হ'ল "চর্যাগীতির সমাজচিত্র", "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য: সমাজের কিছু চিত্র", "বাঙালি মুসলমান লেখকদের ভাবজগৎ (১৮৭০-১৯২০)" এবং "স্বরূপের সন্ধানে"। উল্লিখিত চারটি প্রবন্ধেরই উপজীব্য সাহিত্যে-প্রতিফলিত সমাজবীক্ষণ।[৯৭]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সাহিত্যগবেষণায় আধুনিকসাহিত্য-চর্চার ক্রমপ্রসারতা উল্লিখিত চারটি গ্রন্থেই পরিলক্ষিত হয়। দু'টি ব্যতীত গ্রন্থভুক্ত বাকী প্রবন্ধসমূহের আলোচনার পরিধি আধুনিকসাহিত্য-কেন্দ্রিক। এ-প্রবণতা আশাব্যঞ্জক হ'লেও, আলোচ্য সময়ে এ-জাতীয় সঙ্কলনগ্রন্থের স্বল্পতা আমাদেরকে আশাবাদে উজ্জীবিত করে না।

[ঙ] আধুনিক-সাহিত্যগবেষণা

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণায় প্রধানতঃই উপজীব্য হয়েছে আধুনিক বাংলাসাহিত্য। এ-সময়ের সাহিত্যগবেষণা প্রতিজ্ঞা করেছে ব্যাখ্যার স্থলে বিশ্লেষণ, বিবৃতির পরিবর্তে বীক্ষা, ধারা বর্ণনার বিপরীতে মূল্যায়ন। অর্থাৎ আলোচ্য কালসীমায় ইতিহাসমূলক ও মধ্যযুগনির্ভর সাহিত্যগবেষণার ধারা হয়েছে ম্রিয়মাণ, পক্ষান্তরে আধুনিক-সাহিত্যগবেষণা অর্জন করেছে প্রাধান্য। সাহিত্যগবেষণার এই প্রাধান্যসূচক প্রবণতার পটভূমে দেশকালের অবদান নিঃসন্দেহে গবেষকদের মননে ও মেধায় প্রভাব সঞ্চার করেছে। এ-সময়ে আধুনিকসাহিত্য-ভিত্তিক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তেরোটি। এর মধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্য-কেন্দ্রিক গ্রন্থ পাঁচটি এবং কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও কাব্য অবলম্বনে রচিত দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে, আমরা রবীন্দ্র ও নজরুল-সাহিত্য প্রসঙ্গে রচিত গ্রন্থ পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। অন্যান্য গ্রন্থের আলোচনায় কালানুক্রম অনুসৃত হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম-কে অবলম্বন ক'রে রচিত দু'টি গ্রন্থেরই রচয়িতা রফিকুল ইসলাম; তাঁর 'নজরুল জীবনী' প্রকাশিত হয় ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে, 'কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা'র প্রকাশকাল ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দ। নজরুল ইসলামের জীবনীগ্রন্থের অভাব-হেতু প্রথম গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে।[৯৮] তথ্যসমৃদ্ধ জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন পরিশ্রমসাধ্য গবেষণাকর্ম; রফিকুল ইসলাম এই কর্ম সম্পাদন ক'রে প্রশস্ত করেছেন ভবিষ্যৎ নজরুলসাহিত্য-গবেষণার পথ। তাঁর অপরগ্রন্থ 'কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা' ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রদত্ত পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য রচিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও কবিতা অবলম্বন ক'রে সামগ্রিক কাব্যবিচারের প্রয়াসক্ষেত্রে রফিকুল ইসলাম স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত 'নজরুল নির্দেশিকা' (১৯৬৯) ও 'নজরুল জীবনী' শীর্ষক গ্রন্থদ্বয় পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হ'য়ে আলোচ্য-গ্রন্থের জীবনী-অংশ রচিত হয়েছে। নজরুল-জীবনীকার হিসেবে গ্রন্থকার নির্মাণ করেছেন কঠিন শ্রমসাপেক্ষ মূল্যবান তথ্যভাণ্ডার; যা উত্তরকালের নজরুল-গবেষণায় তাঁর সাহিত্যের অন্যান্য প্রান্ত উন্মোচনে হবে সহায়ক। এতে জীবনীকারের প্রলোভন-নিরপেক্ষতা, নির্মোহ মনোভাব, নিরাসক্ত তথ্য-পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা পূর্বাপর রক্ষিত হয়েছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের তেরোটি অধ্যায়ে কবির সমকালীন কাব্যপরিবেশের পটভূমিতে নির্ণয় করা হয়েছে তাঁর অবস্থান, ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাঁর কবিতার আবেদন ও কাব্যসৌন্দর্য। রফিকুল ইসলামের সাফল্য দ্বিবিধ কারণে বিবেচ্য; প্রথমতঃ, তাঁর শ্রমকল্যাণে রচিত হয়েছে নজরুলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনেতিহাস, দ্বিতীয়তঃ, উন্মোচিত হয়েছে নজরুল--সাহিত্যের প্রধান দিগন্ত—কবিতার সামগ্রিক পরিচয়। কবির কবিমানস ও কাব্য প্রসঙ্গে রফিকুল ইসলামের ব্যাখ্যা লক্ষণীয়:

> নজরুলের কাব্যে প্রবল ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়েছে, তাই বিমূর্ত জীবন চেতনা বা অপ্রত্যক্ষ সত্তার কাছে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে তাঁর মধ্যে জাগরণ দেখা গিয়েছে। সে কারণেই তাঁর কবিতায় সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমে উত্তরণের বা দেহকে ছাড়িয়ে দেহাতীতে যাবার প্রয়াস নেই। তাঁর চিত্রকল্পে বাস্তব ঘটনার চেতনা

> বা উপস্থিতি প্রখর। ···সমাজ সচেতনতা ও সাম্যবাদী চেতনা নজরুলের অন্যতম প্রধান সুর এবং বাংলা কাব্যে এ ধারাকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। ঐসব বৈশিষ্ট্য আধুনিক কবিতার পূর্বাভাস, তবে যতখানি নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে, যতখানি বুদ্ধি ও মনন প্রধান হলে তিনি আধুনিক কবি হতে পারতেন তা তাঁর মধ্যে নেই।··· সমাজ সচেতনতার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি তাঁর বিশ্বাস একাগ্র নয়, আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মলগ্নের কবি নজরুল ইসলাম, কিন্তু তিনি স্বয়ং খাঁটি আধুনিক কবি নন অথচ আধুনিক কবিতার সূত্রপাতে তাঁর ভূমিকা ও অবদান সর্বাপেক্ষা অধিক, কারণ তিনি বাংলা কবিতাকে এক স্থবিরতা ও বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্ত করেছেন।[৯৯]

পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলায় রবীন্দ্রসাহিত্য-বিষয়ক গবেষণাকর্ম সম্পাদনা ছিল কষ্ট-সাধ্য; প্রশাসন এবং জনগোষ্ঠির এক ক্ষুদ্রাংশের বৈরী মনোভাব সৃষ্টি করেছিল প্রতি-বন্ধকতা। তবু মুষ্টিমেয় ক'জন সত্যসন্ধ গবেষক এ-বন্ধুর কর্ম সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে ছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বিতর্কাতীতভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে। দেশকালের এই অনুকূল প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি রবীন্দ্রসাহিত্য-ভিত্তিক পাঁচটি গ্রন্থে।

১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সিদ্দিকা মাহমুদার 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা: চেতনা ও চিত্রকল্প' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত গবেষণা-নিবন্ধের মুদ্রিত-রূপ। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় অভিব্যক্ত চেতনা এবং সে-চেতনার চিত্রকল্পকে গবেষণার বিষয়াবলম্বন করা গবেষকের আধুনিকমনস্কতার পরিচায়ক। বিবৃতিমূলক ও পরিচিতিমুখর সাহিত্যগবেষণার ধারায় সিদ্দিকা মাহমুদার এ মূল্যায়ন-প্রয়াস আমাদের সাহিত্যবিবেচনার ইতিহাসে আশাব্যঞ্জক সংযোজন। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য অনুধাবনীয়:

> ···গদ্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথ অলঙ্কার প্রয়োগে নিরুত্তাপ নন; অনেক ক্ষেত্রেই তিনি পূর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, সমৃদ্ধ ও অভিনব, এ পর্যায়ে ব্যবহৃত চিত্রকল্পমালা শুধু কবিচেতনার প্রকরণ হয়েই আসেনি, সৃজনশীল সত্তার স্বাক্ষরও প্রদান করেছে। এই নিবন্ধে চিত্রকল্পের উক্ত প্রান্তদ্বয় আবিষ্কার এবং নির্ণয় করার যথাসাধ্য প্রয়াস অবলম্বিত হয়েছে।[১০০]

পরিশীলিত-ভাষাশ্রয়ী বাক্যে বিন্যস্ত তাঁর এ-আলোচনা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত; প্রথম পর্যায়ে 'চেতনা ও চিত্রকল্প' শিরোনামায় চেতনা-অনুষঙ্গী চিত্রকল্প এবং চিত্র-কল্পে সঞ্চারিত চেতনাসন্ধান—এই দ্বিমাত্রিক বিশ্লেষণের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যাত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কবিতান্তর্গত চিত্রকল্প সনাক্ত ক'রে নিরাসক্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে 'বিবেচনা' শিরোনামায় চিত্র-কল্প-অবলম্বনে কবিচেতনার স্বরূপ চিহ্নিতকরণ ও তার সূত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। তাঁর ভাষারীতি ও বিশ্লেষণপদ্ধতি লক্ষণীয়:

> গদ্যকবিতার চতুষ্কোণ ভূখণ্ড রবীন্দ্র-কাব্য-আয়তনের একটি সীমিত অংশ। কিন্তু, চেতনার গতিপথ পরিক্রমায় তার মূল্য অপরিসীম। কারণ, সামগ্রিক সাহিত্য-ভাবনার মূলসূত্রটি এখানে উদ্‌ঘাটিত। গদ্যকবিতা পর্যায়ে চিত্রকল্পের সাহায্যে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, রবীন্দ্রনাথের জীবন-জগৎ ও নিসর্গ-দৃষ্টি আক্রান্ত হয়েও অন্তিমে ঋজু এবং সুস্বাস্থ্য। মূলতঃ এই স্বাস্থ্যবান

ঔজ্জ্বল্যে বিধৃত বিশালতর রবীন্দ্র-সাহিত্য। সংশয়, বিষাদ, প্রশ্ন, নৈরাজ্য বার বার তাঁর সৃষ্টি-মানস বিচলিত করেছে, কিন্তু অধিগত করতে পারেনি; রবীন্দ্রনাথ সমস্যাকে স্বীকার করে উত্তরণের পথ খুঁজেছেন এবং পরিশেষে তাঁকে আলোকিত করেছে ঘন, গভীর, ঋদ্ধিশালী এক আত্মিক প্রত্যয়।[১০১]

১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সৈয়দ আকরম হোসেনের 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ' ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রদত্ত পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য লিখিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভ। উল্লিখিত হয়েছে যে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণা প্রধানতঃ বিশ্লেষণাত্মক ও মূল্যায়নধর্মী। এই মূল্যায়নধর্মী সাহিত্যগবেষণায় 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ' বক্তব্য-বিন্যাসের অভিনবত্বে, প্রতিপাদ্য ও প্রমাণের সুশৃংখল উপস্থাপনায় এবং অতি-আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যমূল্যায়ন-পদ্ধতির প্রয়োগ-প্রক্রিয়া বিশিষ্ট। বাংলাদেশের সাহিত্যসমালোচনা প্রধানতঃ সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা ও নন্দনতাত্ত্বিক সমালোচনা—এ-দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত।[১০২] কিন্তু সৈয়দ আকরম হোসেনের এ-গ্রন্থে সংশ্লেষ ঘটেছে ঐ-দুই পদ্ধতির। সমাজসভ্যতার ও ব্যক্তিপ্রতিভার দ্বান্দ্বিক বিকাশের সূত্রনির্দেশ এবং ঔপন্যাসিকের জীবনধর্ম ও উপন্যাসের রূপনির্মাণের প্রকৌশলগত শিল্পগৌরব নির্ণয়—এই দ্বিবিধপ্রয়াস পরস্পরিত হ'য়ে নির্মিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থখানি। "রবীন্দ্রপ্রতিভার মূলসূত্র ও উপন্যাসচিন্তা" শিরোনামায় স্থাপিত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থকার গৃহীত-পদ্ধতি ও প্রতিপাদ্য সম্পর্কে নিম্নরূপ পূর্বাভাষ দিয়েছেন:

> সমাজ-সভ্যতার দ্বান্দ্বিক ক্রমবিকাশের জটিলতর প্রবাহ জাতির সম্মুখে নানা বিভ্রান্তি ও সঙ্কটাকীর্ণ প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়। ঐ সব জিজ্ঞাসার জ্ঞানধর্মী ও হৃদয়বান মীমাংসাসূত্রেই প্রতিভার সৃষ্টিক্ষমচেতনার গভীরতা, উচ্চতা ও বিস্তৃতি পরীক্ষিত হয়। পরীক্ষা-পরিশীলিত চেতনাস্রোতের শব্দনির্মিত রূপকল্পই উপন্যাস এবং সাহিত্য। সুতরাং কোন উপন্যাসের শিল্পগৌরব, মহত্ত্ব এবং তার ব্যতিক্রম, ঔপন্যাসিকের চেতনালোকের গৌরব, মহত্ত্ব ও ব্যতিক্রমিতার সঙ্গে জৈবিক ঐক্যে সম্পর্কিত। সঙ্গত কারণে কোন ঔপন্যাসিকের শিল্পকর্ম বিবেচনার পূর্বে, ঐ প্রতিভার প্রাণচঞ্চল নির্যাসশক্তি আবিষ্কার ও তার নিরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। সেই সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য ও সঙ্কেত-আলোকে কোনো প্রতিভার আত্মস্থ অভিজ্ঞতা-কেন্দ্র এবং বিকশিত আবেগময় বিস্তৃতির সীমানা ও তার আভ্যন্তর বৈচিত্র্যসমূহ অবলোকন করা সম্ভব।[১০৩]

গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায় "রবীন্দ্রপ্রতিভার মূলসূত্র ও উপন্যাসচিন্তা"য় নির্দেশিত হয়েছে বিভিন্ন চেতনাস্রোতের সম্মিলনে সংগঠিত রবীন্দ্রনাথের চেতনালোক এবং তৎসঞ্জাত ঔপন্যাসিকদৃষ্টি। এতদ্ব্যতীত, গ্রন্থকার রবীন্দ্রউপন্যাসকে চারটি পর্যায়ভুক্ত ক'রে স্বতন্ত্র চারটি অধ্যায়ে উপন্যাসে-বিধৃত ঔপন্যাসিকচেতনা এবং তার শিল্পসংগঠন প্রসঙ্গের মূল্যায়ন করেছেন। এর উল্লেখযোগ্য যোজনা 'করুণা' ও 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের পুনর্মূল্যায়ন। রবীন্দ্রসাহিত্যসমালোচকবৃন্দ-কর্তৃক উপন্যাস হিসেবে উপেক্ষিত ও অস্বীকৃত 'করুণা'র প্রমাণ-সাপেক্ষ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার এ-মতের প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী হয়েছেন যে, "করুণা উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ক্রটির ভস্মস্তূপ নয়, এর গভীরে অফুরন্ত উত্তাপ-উৎসও বর্তমান; যা নিরীক্ষাধর্মী চলমান রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্তরঙ্গ বীজশক্তি।"[১০৪] 'চতুরঙ্গ' বাংলা-সাহিত্যসমালোচনায় ছিল "বিতর্কিত ও সন্দিগ্ধ শিল্পকর্ম"; সৈয়দ আকরম হোসেন এ-গ্রন্থে শিল্পোৎকর্ষ ও আঙ্গিকবিবেচনার প্রশ্নে একে রবীন্দ্র-উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্মিতি হিসেবে করেছেন মূল্যায়ন। ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক ভাষাভঙ্গির সংশ্লেষে চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নিম্নরূপ বিশিষ্ট বিবেচনা এ-গ্রন্থের একটি উজ্জ্বল এলাকা:

শ্রীবিলাসের অধ্যাত্মলোক নেই, ঈশ্বর নেই ; তার দামিনীও রইল না। এমন সীমাহীন শূন্যতায়, বহুস্তরীভূত বেদনায় রবীন্দ্রনাথ আর কোনো চরিত্রকে নিক্ষেপ করেননি। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জীবনের দ্বিমুখী বঞ্চনার ট্র্যাজেডিকে 'চতুরঙ্গে'ই প্রথম শিল্পময় করেন। পরিণামে ভগ্ন নীলকুঠি, তার নৈঃসঙ্গ্য এবং জীর্ণ-সত্তায় শূন্যতা ও স্মৃতিলালনকারী একাকী শ্রীবিলাস—যেন পরস্পর সমার্থক, অন্তঃস্পন্দনে প্রতিসম, প্রতীকী পরমার্থে লোকোত্তর। আধুনিক যে মানুষ অধ্যাত্মবিশ্বাস থেকে উন্মূলিত, অথচ জীবনে পরাভূত, বঞ্চিত-শ্রীবিলাস সে-সব বিপন্ন-অস্তিত্ব মানুষের পূর্বপুরুষ। কেবল আঙ্গিক-উদ্ভাবনার অপূর্বতায়, কিংবা মগ্নচৈতন্যপ্রবাহের অনুষঙ্গবয়নে অথবা আশ্চর্য অলঙ্কারযোজনা-দক্ষতাতেই নয়, জীবনবীক্ষণের এই বিস্ময়কর অগ্রগামিতায়, 'চতুরঙ্গ' সমুজ্জ্বল।[১০৫]

১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় মুহম্মদ মজির উদ্দীনের 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশ-চেতনা' শীর্ষক গ্রন্থখানি। এটি গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রূপে ভারতের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত। গ্রন্থটি ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত ; প্রথম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন সমাজ-পটভূমি ব্যাখ্যা ক'রে শিল্পীমানস নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে ; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে 'গল্পগুচ্ছে'র আলোকে বাংলার আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বিকাশধারার পর্যালোচনা হয়েছে উপস্থাপিত। এ-গ্রন্থে গবেষকের নিষ্ঠার পরিচয় আমরা ততটা প্রত্যক্ষ করিনা। সত্যানুসন্ধান এবং সত্য-নির্ণয়, তথ্য-আবিষ্কার ও তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা সাহিত্যগবেষণার মূলসূত্র। শুধুমাত্র সততা আর অকৃত্রিম আন্তরিকতাই যে সার্থকপ্রসূ গবেষণার অনুপ্রেরণা নয়—বর্তমানগ্রন্থ আমাদের এ-ব্যাপারে সচেতন ক'রে তোলে। মুহম্মদ মজির উদ্দীনের প্রতিপাদ্য নির্ণয়ের পদ্ধতি ও ভাষারীতি প্রসঙ্গতঃ উদ্ধৃত হল :

[ক] "সমাপ্তি গল্পের মধ্যে কবি তাঁর স্বদেশের মূর্তিখানি জীবন্ত করে তুলেছেন। অপূর্বকৃষ্ণ সহর থেকে নিজ গ্রামে এল—সেই গ্রাম উত্তর বঙ্গের যে-কোন গ্রামের মধুর মূর্তি। শ্রাবণের ক্ষুদ্র পল্লীনদী।'জল গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ পর্যন্ত চুম্বন করেছে। এই নদী পথেই অপূর্ব এসেছে। 'নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল ব্যাগসমেত অপূর্ব কাদায় পড়িয়া গেল।' '...ব্যাগে কাদা মাখিয়া গাছের ছায়া দিয়া অপূর্ব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। অকস্মাৎ পুত্রের আগমনে বিধবা মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর দধি রুই মাছের সন্ধানে দূরে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।' এই হল সরল-সুন্দর সোনার বাংলা। প্রকৃতির প্রাণময়তা, মায়ের পুলকিত হৃদয়, প্রতিবেশীর অকৃত্রিম ভালবাসা আর ক্ষীর দধি রুই-এর বাংলা আজ স্বপ্ন মনে হলেও একদিন তা সত্য ছিল।"[১০৬]

[খ] "অতিথি'র তারাপদ ঘরজামাই হবার আগেই উধাও হয়েছিল। 'পণরক্ষা'(১৯১১) গল্পের রসিক শহরের ধনী লোকের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরজামাই হয়েছিল। গ্রামের বাড়ি এবং দরিদ্র দাদার কথা সে বিস্মৃত হয়নি কিন্তু বাড়ি এসে দেখল দাদা ইহলোকে নেই, সংসার বিধ্বস্ত। এরপর কবির আর কোন গল্পে এ প্রসঙ্গ নেই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আত্মমর্যাদাবোধ এবং অর্থনৈতিক কারণে এ-প্রথা সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে।"[১০৭]

সনুজীদা খাতুন-রচিত 'রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ্' ভারতের বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রদত্ত পিএইচ. ডি. উপাধির গবেষণা-অভিসন্দর্ভ। ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এ-গ্রন্থে

সন্‌জীদা খাতুন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে গবেষণার বিষয়ভুক্ত করার ক্ষেত্রে এটাই তাঁর প্রথম উদ্যোগ এবং সে-সূত্রে তিনি এদেশে পথিকৃতের দাবীদার। গবেষণার অন্বিষ্ট প্রসঙ্গে বক্তব্য গ্রন্থকারের লক্ষণীয়:

> রবীন্দ্রবাণী ও সুরের আকর্ষণ আমার মনে স্বতঃই যে-সব বোধের সঞ্চার করেছে, তারই পর্যালোচনা "রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ্" রচনায়। কিছু গানের বাণী সুর ও ছন্দের বিন্যাস বৈশিষ্ট্য বুঝবার চেষ্টা করেছি, কখনো নানা প্রকরণগত বিশ্লেষণের সাহায্যে, কখনো একান্ত মনে গানের ওই তিনটি অঙ্গকে স্পর্শ ক'রে ক'রে।[১০৮]

উপক্রমণিকা-ব্যতীত বর্তমান-গ্রন্থ চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রথম অধ্যায়ে "রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ্" শীর্ষক আলোচনায় ভাবসম্পদের স্বরূপ ব্যাখ্যা ক'রে রবীন্দ্রনাথের গানের "আধেয় বিষয়ের বৈভব" বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বাণীপ্রধান গান, সুরপ্রধান গান, ছন্দপ্রধান গান—এ-তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে পর্যায়ক্রমে পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে নির্ণীত হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ। সন্‌জীদা খাতুনের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত, বাক্যনির্মাণরীতিও তাঁর নিজস্ব। এ-প্রসঙ্গে একটি বাণীপ্রধান গানের মূল্যায়ন লক্ষণীয়:

> কথায় সুরে ছন্দে বাউলের ধাঁচটি পাওয়া যায় 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে', গানটিতে। 'আমি' বলতে যে ব্যক্তিসত্তা, তার লয় আছে কি? এই রকমের একটা তাত্ত্বিক প্রশ্ন উঠেছে এখানে। বাউলের উপলব্ধি এই যে, বিশ্বের প্রাণের বাটে, চির-আমির খেলা চলেছে। আজকের 'এই আমি' মিশে যায় 'চিরদিনের সেই আমি'তে। কাজেই চিরস্মৃত হয়ে থাকবার জন্য ব্যক্তি-বিশেষের ব্যাকুলতার কোনো অর্থ নেই। তাই বাউলের গান বলছে—ব্যক্তি আমি যখন আপন গণ্ডি ভেঙে সবার সঙ্গে মিশে যাবে, তখন বিশেষ গণ্ডির জীবটিকে নাই-বা মনে রাখলে কেউ— তাতে ক্ষোভ কি? বাউল জানে, 'সফল খেলা'তেই সে মিশে থাকবে, কারণ, নানা রূপের লীলার মধ্যে দিয়েই এক 'আমি'র অনন্ত লীলাপ্রবাহ চলেছে।[১০৯]

১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ লাভ করে গোলাম মুরশিদের 'রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ: পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা' শীর্ষক গ্রন্থখানি।[১১০] রবীন্দ্রসাহিত্যে পূর্ববঙ্গের প্রভাব এবং প্রতিফলনের বিশ্লেষণ এবং পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্র-অনুশীলনের ইতিহাস-নির্ভর গবেষণাগ্রন্থ রচনায় এটাই প্রথম প্রয়াস। বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণায় তাঁর উপজীব্য প্রসঙ্গ নতুন; তিনি এ-কর্ম সম্পন্ন ক'রে যেমন পথিকৃতের সম্মান অর্জন করেছেন, তেমনি উত্তরকালের রবীন্দ্রগবেষকদের জন্যেও নির্দেশ করেছেন নতুন পথসন্ধান। সূচনা এবং উপসংহার ব্যতীত গ্রন্থটিকে প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগের অধ্যায়-চতুষ্টয়ের আলোচিত বিষয় যথাক্রমে "রবীন্দ্রমানসের আদি-পর্ব (১৮৯০ সাল পর্যন্ত)", "মুক্তির প্রথম আস্বাদন: পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা", "রবীন্দ্রমানসের বিবর্তন: বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার" এবং "রবীন্দ্রসাহিত্যে পূর্ববঙ্গ"। দ্বিতীয় ভাগের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ব্রিটিশশাসিত পূর্ব-বঙ্গে রবীন্দ্রচর্চার পটভূমি এবং পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বঙ্গে রবীন্দ্রচর্চার ইতিহাস। রবীন্দ্রমানস গঠনে পূর্ব-বঙ্গের ভূমিকা প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের বক্তব্য অনুধাবনীয়:

> প্রাক্-পূর্ববঙ্গ পর্বে রবীন্দ্রমানস ছিলো অনেকটা আবদ্ধ জলাশয়ের মতো, বিশ্বের প্রাণগঙ্গার সঙ্গে তার যোগ ছিলো না। ফলে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে দৃষ্টি ও

> মনোভাব ছিলো কয়েকটি নির্দিষ্ট সূত্রে বাঁধা। ···কিন্তু পদ্মাপ্রবাহবিধৌত পূর্ববঙ্গের উদার প্রকৃতি এবং বৃহৎ জীবনসংসারের দ্বার যখন তাঁর কাছে অবারিত হয়, আত্মীয়তা স্থাপিত হয় চলমান জীবনের সঙ্গে, তখন স্বভাবতই তাঁর নয়নের সামনে থেকে বহুকালের পুঞ্জীভূত অন্ধকার ঘুচে গেলো। অতঃপর দু-একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত, যেখানেই তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন, সেখানেই ফুটে উঠেছে আলোর অমলকমলখানি। তিনি সেই নবলব্ধ দৃষ্টি দিয়ে যখন বিশ্বের দিকে তাকালেন, তখনই আকাশ-ভরা সূর্যতারা, এবং বিশ্ব-ভরা এক বিরাট প্রাণের সন্ধান লাভ করলেন।[১১১]

১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বেগম আক্তার কামালের 'বিষ্ণু দে-র কাব্য : পুরাণ প্রসঙ্গ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষার জন্য রচিত গবেষণা-নিবন্ধের গ্রন্থ-রূপ। তিরিশোত্তর কালের বাংলা কবিতাকে গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ ক'রে গ্রন্থকার তাঁর আধুনিকমনস্কতাকেই অভিব্যক্ত করেছেন। বর্তমান-গ্রন্থে তিরিশোত্তর বাংলা কবিতার বিশিষ্ট কবিব্যক্তিত্ব বিষ্ণু দে'র কাব্যান্তর্গত পুরাণ-প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কাব্যে ব্যবহৃত একটি বিশেষ প্রসঙ্গ-অবলম্বনে অভিসন্দর্ভ রচনা ক'রে তিনি সাহিত্য—মূল্যায়নের আধুনিক পদ্ধতিকে চিহ্নিত ক'রতে হয়েছেন সমর্থ। "প্রাসঙ্গিক" এবং "উপসংহার" ব্যতীত গ্রন্থখানি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে "কবিতা ও পুরাণ" শিরোনামায় নির্ণীত হয়েছে পুরাণ ও কবিতার সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য এবং বিশ্লেষিত হয়েছে পুরাণের সঙ্গে কবিতার সম্পর্করহস্য। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিষ্ণু দে'র কবিমানস সংগঠনে পুরাণের প্রভাব এবং কাব্যে তার অনিবার্য-প্রতিফলন প্রসঙ্গ ব্যাখ্যাত হয়েছে। অপর তিনটি পরিচ্ছেদে মূল্যায়িত হয়েছে কবিতায় পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহারে কবির রচনা-কৌশল এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে সনাক্তকৃত পুরাণ-অনুষঙ্গী চিত্রকল্প, উপমা-উৎপ্রেক্ষা। বিষ্ণু দে'র কাব্যে প্রযুক্ত পুরাণ-প্রসঙ্গের অনিবার্যতা ব্যাখ্যায় গ্রন্থকারের বক্তব্য উদ্ধৃত হল :

> প্রকৃত সাম্যবাদী কবি হওয়ার মতো মানসিক গঠন তাঁর নয়। তদুপরি সাম্যবাদী কবির সম্মুখে টেকনিকগত সমস্যার জটিলতা থাকেনা, তার প্রকাশভঙ্গি সরাসরি, অপোরক্ষ, কোন প্রতীক বা রূপকের বাতাবরণে আচ্ছন্ন নয়। বিষ্ণু দে-র কবিতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁকে অনলস প্রযত্নে গড়ে তুলতে হয়েছে সেই আঙ্গিক ; যেখানে বিষয়ের অবতারণা মাত্র মূল মানসিকতা ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠবে, নির্মাণ করবে সেই এ্যাটিচুড যা চিহ্নিত করবে তার স্বাতন্ত্র্যকে, চেতনাকে ভাবাবেগাশ্রিত নয় তীক্ষ্ণ ও সজাগ করবে। এই কারণে দরকার হয়েছে একটি দীর্ঘপোষিত চেনাজানা প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ, একই সঙ্গে বা নানামুখী ভূমিকা পালনক্ষম টেকনিক তৈরির ক্ষেত্রে যা হতে পারে ফলপ্রসূ। অথবা যা একটি বিশিষ্ট ফর্মূলার মতো বিষয় ও বিষয়ীর দ্বন্দ্বাতীত কেন্দ্রবিন্দু আবিষ্কারে হতে পারে মর্মভেদী। পুরাণ তাঁর কবিতায় উক্ত ভূমিকারূপে অনিবার্যতা পেয়েছে।[১১২]

মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের 'মীর মশাররফের গদ্য রচনা' শীর্ষক গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় লিখিত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. গবেষণা-অভিসন্দর্ভের বাংলা রূপান্তর। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এ-গ্রন্থে মীর মশাররফ হোসেনের জীবন ও গদ্যচর্চার পরিচিতি-মূলক ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ইংরেজি থেকে ভাষান্তরিত হওয়ায় এর বাক্যবিন্যাস ও ভাষারীতিতে অস্বাচ্ছন্দ্য বর্তমান। উদাহরণ লক্ষণীয় :

সর্বশেষে জয়নাবের কথা উল্লেখ করতে হয়। 'বিষাদ সিন্ধু'র সমস্ত ঘটনাই ঘটবে জয়নাবকে কেন্দ্র করে। এজিদ ও হাসান হোসেনের সংঘর্ষের মূল কারণ জয়নাব। জয়নাব সতীসাধ্বী স্ত্রী। প্রথম স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে দ্বিতীয়বার পরিণীতা হন হাসানের সঙ্গে। ভাগ্যের পরিহাসে হাসানের মৃত্যুর পর সে এজিদের কারাগারে বন্দিনী হন। কারাগারে থাকাকালে তার মনে হতো কারবালার সমস্ত রক্তপাতের জন্য সেই যেন দায়ী।[১১৩]

আবদুল কাদিরের 'কাজী আবদুল ওদুদ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে। এতে কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭৩) ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার তাঁর জীবনীর রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন। এতদ্ব্যতীত, "বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম ভাবুক ও চিন্তাবিদ" আবদুল ওদুদের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন এতে সংযুক্ত হয়েছে। তাঁর এই ক্ষুদ্রকায় গবেষণাগ্রন্থ বাংলাদেশে ওদুদ-অনুশীলনের ক্ষেত্রে পথিকৃতের দাবীদার।

১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত নাজমা জেসমিন চৌধুরীর 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি' ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে প্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য রচিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভের মুদ্রিত-রূপ। গ্রন্থকার, "উপক্রমণিকা" এবং "উপসংহার" ব্যতীত, গ্রন্থটিকে ছ'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি "হিন্দু বাঙালী মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ", "হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ" এবং বাংলার অর্থনৈতিক সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি ব্যাখ্যা ক'রে বাংলা-উপন্যাস উদ্ভবের সূত্র এবং বঙ্কিম-মানস বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। গ্রন্থকার দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পরিচ্ছেদে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) বিশেষ বিশেষ উপন্যাসে বিধৃত সমকালীন রাজনীতির প্রভাব ও প্রেরণা ব্যাখ্যা করেছেন। "পূর্ব বাংলার উপন্যাস" শিরোনামায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে "মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারণের পটভূমি" বিশ্লেষণ এবং বিশ শতকের বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক- অর্থনৈতিক-প্রবাহ ব্যাখ্যা ক'রে কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮), সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২), সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯২৩), আবু রুশদ (১৯১৯), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১) প্রমুখের উপন্যাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং ঘটনা-পুঞ্জ কিভাবে প্রতিফলিত ও সঞ্চারিত হয়েছে তার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ[১১৪] থেকে রচিত এ-গ্রন্থে ঔপন্যাসিকদের শ্রেণীরূপ ও শ্রেণীস্বার্থ পরীক্ষিত হয়েছে। তাঁর মন্তব্য লক্ষণীয়:

> বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু জাতীয়তাবোধের স্রষ্টাদের অন্যতম। শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর এই ধারার অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ অন্য ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম। তাঁর চেতনা বুর্জোয়া উদারনৈতিক। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্করের মধ্যে সামন্ত-বাদী চিন্তা চেতনা প্রবল। রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটা ভিন্নধর্মী। তিনি শ্রেণীদ্বন্দ্বের বাস্তবতায় বিশ্বাসী এবং এর অনিবার্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ।[১১৫]

১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় সৈয়দ আবুল মকসুদের 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থ। ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্যকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গ্রন্থকার কৃতিত্বের দাবীদার। গ্রন্থটি প্রধানতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগে তিনি সঙ্কলন করেছেন ঔপন্যাসিকের জীবনী এবং ব্যাখ্যা-প্রয়াসী হয়েছেন তাঁর সাহিত্য-কর্মের। দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবেশ করা হয়েছে ঔপন্যাসিকের অগ্রন্থিত রচনা ও পত্রাবলি।

উল্লেখযোগ্য, এই অগ্রন্থিত রচনাসমূহ সংগ্রহের কৃতিত্বও বর্তমান গ্রন্থকারের। তিনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রমাণনিষ্ঠ জীবনী-রচনা এবং অগ্রন্থিত-রচনাবলী সংগ্রহ ক'রে বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার ক্ষেত্রে ওয়ালীউল্লাহ্‌-চর্চার পথকে করেছেন প্রশস্ত।

এ-পর্যায়ের শ্রেণীকরণকৃত সর্বশেষ গ্রন্থ মোরশেদ শফিউল হাসানের 'বেগম রোকেয়া : সময় ও সাহিত্য', বেগম রোকেয়ার (১৮৮০-১৯৩২) সমকাল ও সাহিত্যের পরিচয়-দানের প্রয়াস।[১১৬] গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা-পদ্ধতি এবং বিশ্লেষণ-প্রচেষ্টা, তাঁকে নিষ্ঠাবানগবেষক হিসেবে পরিচিত করেছে। তাঁর শ্রমসাধনায় এ-দেশের গবেষণাক্ষেত্রে সংযোজিত হয়েছে বেগম রোকেয়ার সাহিত্যচর্চার পটভূমি; তাঁর শিক্ষা ও সমাজচিন্তা বিশ্লেষণে এবং তাঁর রচনার পরিচিতি-বর্ণনায় মোরশেদ শফিউল হাসান নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের বিগতদশকে সম্পন্ন গবেষণাকর্ম মূল্যায়ন-প্রবণতাকেই প্রধানতঃ অঙ্গীকার করেছে; প্রাধান্যসূচক এই প্রবণতা উত্তরকালের সাহিত্যগবেষণায় দূরসঞ্চারী ভূমিকা রাখবে নিঃসন্দেহে। গ্রন্থভিত্তিক কালানুক্রমিক আলোচনায় এটি স্পষ্টতঃই প্রতিভাত হয়েছে যে, বিবরণ, বিবৃতির স্থল ক্রমশঃ অধিকার ক'রে নিচ্ছে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। বস্তুতঃ, মূল্যায়ণপ্রবণতা আধুনিক চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি; বাংলাদেশের সাহিত্য গবেষণায় প্রাধান্যসূচক এই ধারা গবেষকদের আধুনিকমনস্কতাকেই আমাদের কাছে ইঙ্গিতময় ক'রে তোলে।

[চ] সাহিত্যগবেষণা প্রসঙ্গ

১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা' শীর্ষক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে বাংলাসাহিত্য-বিষয়ক উচ্চতর গবেষণা এবং গবেষক-দের পরিচয়-পঞ্জি। মুখ্যতঃ, এ-দেশের সাহিত্যগবেষণাই তাঁর নিরীক্ষা ও সঙ্কলনের ক্ষেত্র; যদিও এর পরিশিষ্টে সংযুক্ত হয়েছে ভারতের পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যা লয়ের ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত গবেষকদের তালিকা। এ-ধরনের শ্রমসাপেক্ষ গ্রন্থনা যেমন একটি দেশের সাহিত্যগবেষণার ধারাকে চিহ্নিত করতে সমর্থ, তেমনি এর অন্তর্গত তথ্যপুঞ্জ ভবিষ্যৎ-গবেষকদের পথনির্দেশনার ক্ষেত্রেও হবে সহায়ক। মোহাম্মদ মনিরুজ্জা-মানের এ-শ্রমকঠিন প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হয়েছে এদেশের সাহিত্যগবেষণা-ইতিহাসের প্রথম তথ্যভিত্তিক রূপরেখা।

উপসংহার

পাকিস্তানশাসিত পূর্ব-বাংলা এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণার কালানু-ক্রমিক পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক মূল্যায়নকে আমরা 'বাংলাদেশে সাহিত্যগবেষণার ধারা'— এই শিরোনামায় উপস্থাপন করেছি। বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে সম্পন্ন গবেষণার প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্রিটিশশাসিত পূর্ব-বাংলার মুষ্টিমেয় গবেষণা-প্রয়াসকে আমরা বিবেচনা করেছি এ-দেশের সাহিত্যগবেষণার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে। তথ্যনিষ্ঠ ও প্রমাণসাপেক্ষ কালানুক্রমিক পরিচিতির মাধ্যমে এবং প্রাসঙ্গিক প্রবণতা-নির্দেশ ও সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের সাহায্যে আমরা এ-প্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি যে, এ-দেশের সাহিত্যগবেষণা তার সূচনাকাল থেকে ঐতিহ্যনির্ভর-পরিচিতিমূলক এবং ধারা বর্ণনার যে রীতিকে অঙ্গীকার করেছিল, বোধি ও চিন্তার বিবর্তনে তা ক্রমশঃ পরিত্যাজ্য হয়েছে এবং এর স্থান অর্জন করেছে বিশ্লেষণাত্মক-মূল্যায়নধর্মী সাহিত্যগবেষণা। আমরা লক্ষ্য করেছি জ্ঞানান্বেষণের এ-চর্চায় দেশকাল-রাজনীতির প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব। পরিশেষে সাহিত্যগবেষণার

এ-কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে যে, সমাজসভ্যতার ক্রমবিবর্তনধারায় এ-দেশের সাহিত্যগবেষণা ক্রমশঃ আধুনিক মূল্যায়নপ্রবণতাকে প্রতিজ্ঞা ক'রে নিয়ে গ্রহণ করেছে নিরপেক্ষ সত্যসন্ধানের পথ।

তথ্য-নির্দেশ

১ সৈয়দ আলী আহসান, 'পদ্মাবতী', (প্রথম প্রকাশ ; ঢাকা : ষ্টুডেণ্টওয়েজ, ১৯৬৮) ভূমিকা ; পৃষ্ঠা ১৯

২ হুমায়ূন আজাদ : "বাংলাদেশের প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্য [১৯৭২-৭৯]", 'পট-ভূমি' ; সম্পাদক—নার্গিস রফিকা বানু, (পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ; ঢাকা, ১৯৮১) "...সাহিত্য সমালোচনা নামী বস্তুর অস্তিত্বের পেছনে আছে সৃষ্টিশীল সাহিত্য। কবি-ঔপন্যাসিক-গাল্পিক-নাট্যকারদের বলতে পারি মৌলিক ও প্রথম পংক্তির প্রতিভা। প্রাবন্ধিক ও সমালোচকেরা, যেহেতু মাথা তোলেন অন্যকে ভিত্তি ক'রে অমৌলিক ও দ্বিতীয় পংক্তির প্রতিভা। যাঁর আছে জীবনানন্দ হওয়ার শক্তি, তিনি কেনো হ'তে যাবেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; যাঁর আঙুল লিখতে পারে 'পদ্মানদীর মাঝি", তিনি কেনো রচনা করবেন শরৎচন্দ্র-বিষয়ক বই।" পৃ. ৯

৩ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'বাংলা সাহিত্যে উচচতর গবেষণা', (প্র. প্র ; ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১)

"...সাহিত্যের গবেষক ঐতিহ্যসন্ধান ও মূল্যায়নে নিমগ্ন থেকে বর্তমানের প্রেক্ষিতে তৌল করেন স্মৃতিমানিকোজ্জ্বল অতীত। জটিল বর্তমানে তাই জরুরী একাধারে ভবিষ্যৎ ও অতীতসঞ্চারী অন্তর্দৃষ্টি। সাহিত্যের উচচতর গবেষণা এই কারণে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার গবেষণা অপেক্ষা ভিন্নতর। হয়ত বা দুরূহতর।"পৃ. ১

৪ সৈয়দ আকরম হোসেন ; "বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ", 'সাহিত্য পত্রিকা' ; সম্পাদক, নীলিমা ইব্রাহিম, (সপ্তদশ বর্ষ ; দ্বিতীয় সংখ্যা ; ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮০)

৫ দ্রষ্টব্য মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ইতিহাস," 'সাহিত্য পত্রিকা' ; সম্পাদক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, (পঞ্চবিংশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ; ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৮) পৃ. ৩১০-১১,৩৩৫-৩৮

৬ দ্র. "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ইতিহাস" পৃ. ৩১১-১৯, ৩৩৮-৫২

৭ শ্রী ব্যোমকেশ মুস্তফী, "নিবেদন", মুনশী শ্রী আবদুল করিম ; 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', (প্রথম প্রকাশ ; কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ১৩২০)

৮ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত গ্রন্থগুলি হচ্ছে—'রাধিকার মানভঙ্গ' (নরোত্তম ঠাকুর-বিরচিত, কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯০১), 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২০), 'সত্য-নারায়-ণের পুঁথি' (কবিবল্লভ-বিরচিত, কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯১৫), 'মৃগলুব্ধ সংবাদ' (রামরাজা-বিরচিত, কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯১৫), 'মৃগলুব্ধ' (দ্বিজরতিদেব-বিরচিত, কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯১৫), 'গঙ্গামঙ্গল' (দ্বিজ মাধব-বিরচিত, কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯১৬), 'গোরক্ষ বিজয়' (সেখ ফয়জুল্লা-বিরচিত, কলিকাতা, ১৯১৭) ,'গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস' (বাসুদেব ঘোষ-বিরচিত, কলিকাতা, ১৯১৭), 'সারদামঙ্গল বা অষ্টমঙ্গলার চতুষ্পহরী পাঁচালী' (মুক্তারাম সেন-বিরচিত, কলিকাতা, ১৯১৭)।

৯ আহমদ শরীফ, ভূমিকা, 'পুথি-পরিচিতি', সম্পাদক-আহমদ শরীফ, (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮)

১০ [ক] আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত

[খ] মুহম্মদ এনামুল হক, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', (তৃতীয় সংস্করণ ; ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স, ১৯৬৮)
"বাংলার খ্যাতনামা মৌলিক গবেষক মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদই আমার এই মাটির প্রদীপের একমাত্র না হইলেও, মূল নির্মাতা।"(ভূমিকা)

১১ মুহম্মদ এনামুল হক এবং সাহিত্যসাগর আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, 'আর্‌কান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য', (প্র. প্র ; কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৩৫) গ্রন্থকারদ্বয়ের বক্তব্য :
"বলা বাহুল্য, বর্তমান পুস্তকখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস নহে ; ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অজ্ঞাত দিকের অংশ বিশেষের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-পুস্তক মাত্র।"

১২ পূর্বোক্ত, দীনেশচন্দ্র সেন ; ভূমিকা

১৩ 'আর্‌কান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য', পৃ. ৯০-৯১

১৪ সৈয়দ আকরম হোসেন, "কথামালা এবং পূর্ব বাঙলার কবি ও কবিতা", 'সাময়িক ধারার প্রবন্ধ' : আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত, (প্র. প্র ; ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৬) পৃ, ১১৮-২৩

১৫ এ-সময়ে প্রকাশিত লোকসাহিত্যের সঙ্কলনগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি' (তৃতীয় খণ্ড, হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা, ১৯৪৮), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌'র 'পদ্মাবতী' (ঢাকা, ১৯৫০), মযহারুল ইসলামের 'পূর্ব বাংলার গীতিকা' (প্রকাশনা বিভাগ, পাকিস্তান সরকার, ঢাকা, ১৯৫৪), এবং মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর 'আয়না বিবি' (গীতিকা : পুনর্বর্ণনা ; আঞ্চলিক প্রকাশনা দফতর, ঢাকা, ১৯৫৫)। অভিন্ন-সময়ে পূর্ব-আবিষ্কৃত পুথির যে-ক'টি সম্পাদনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সেগুলি হচ্ছে আহমদ শরীফের 'লায়লী-মজনু' (দৌলত উজির বাহরাম খান-বিরচিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৮), 'আলাউলের তোহফা' (বাংলা বিভাগ ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮), 'পুথি-পরিচিতি' (আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সঙ্কলিত পুথি পরিচিতির পুনসম্পাদনা, বাংলা বিভাগ ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮)।

১৬ মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান,। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (প্র. প্র ; ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬) "কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দফতরের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার ভার পড়ে জনাব ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, সৈয়দ আলী আহসান এবং আমার ওপর। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করেন ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ আর আধুনিক যুগের (মূলত বৃটিশ আমলের) ইতিহাস রচনা করি আমি ও সৈয়দ আলী আহসান।" (ভূমিকা)

১৭ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', (পরিমার্জিত পুনর্মুদ্রণ ; ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, আষাঢ় ১৩৮০)

১৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

২০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

২১ মুহম্মদ আবদুল হাই, ভূমিকা, পূর্বোক্ত

২২ মুহম্মদ এনামুল হক, ভূমিকা, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', (তৃ. সং; ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স, ১৯৬৮)

২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১-২

২৪ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন যথাক্রমে ১৯৪২ ও ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে।

২৫ বর্তমান নিবন্ধের পরিশিষ্টে উপস্থাপিত গ্রন্থপঞ্জি দ্রষ্টব্য

২৬ দ্র. সুকুমার সেন, 'ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য', (প্র. প্র.; কলিকাতা, ১৯৫১)

২৭ আনিসুজ্জামান; "অবতরণিকা", 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', (প্র. প্র; ঢাকা: লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪)

২৮ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' [প্রথম খণ্ড], (প্র. প্র; ঢাকা: হাসি প্রকাশালয়, ১৯৬০)
"আলাওল মুসলমানের জাতীয় কবি। মুসলমানের জাগরণকে স্থায়ী করিতে হইলে আলাওলের গ্রন্থাবলীর সম্পাদন ও প্রকাশ বিশেষ প্রয়োজন।" পৃ. ৬৭

২৯ মযহারুল ইসলাম, 'কবি হেয়াত মামুদ', (প্র. প্র; রাজশাহী: বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১)
"কাব্য হিসাবে দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও মনসামঙ্গলকে কেহ কেহ পূর্ব বাংলার জাতীয় মহাকাব্য বলিতে চাহিয়াছেন জঙ্গনামা অনেকটা সেই অর্থে মুসলিম বাংলার জাতীয় মহাকাব্য। ইহার মূলে রহিয়াছে জাতীয় প্রেরণা। তাহা ছাড়া একদিকে আদর্শনিষ্ঠা এবং অন্যদিকে নির্মম Tragedy প্রভৃতি মিলিয়া জঙ্গনামায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কাহিনীর গতি ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাতের মধ্য দিয়া পাঠকের চিত্তকে পরিণতির পথে সজোরে টানিয়া লইতে পারে। শুধু যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব-কোলাহলের মাধ্যমেই যে ইহা সম্ভব হইয়াছে তাহা নহে, অপূর্ব আত্মশক্তি ও আদর্শনিষ্ঠায় বলিয়ান চরিত্রগুলির সার্থক চিত্রণ এবং বিকাশও এই গতিকে অপরিহার্য ও অবিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্ত কারণে জঙ্গনামা কাব্য-গুলিকে বাংলার মুসলিম সমাজের মহাকাব্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।" পৃ. ২২৭

৩০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৭ খণ্ড, বিশ্বভারতী ১৩৮৪)। এ-প্রসঙ্গে বালকবয়সে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র স্ব-কৃত সমালোচনা প্রসঙ্গে উত্তর-কালে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়:
"...আমি অল্পবয়সে স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম।"

৩১ আবুল কাসেম ফজলুল হক, "বাংলাদেশের প্রবন্ধ ও গবেষণা: কয়েকটি প্রসঙ্গ কিছু মন্তব্য", 'বইয়ের খবর'; সম্পাদক, বিজলীপ্রভা সাহা, (দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা: ঢাকা, ১৩৮৬)

৩২ এ-সময়ে প্রকাশিত সংগৃহীত লোকসাহিত্যের সম্পাদনাগ্রন্থের মধ্যে মুহম্মদ মনসুর-উদ্দীনের 'হারামণি' (চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯; পঞ্চম খণ্ড, মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১; সপ্তম খণ্ড,

বাংলা একাডেমী, ১৩৭১), আশরাফ সিদ্দিকীর 'কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী' (প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৫), মযহারুল ইসলামের 'কবি পাগলা কানাই' (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৩৬৬) এবং মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'ঢাকার লোককাহিনী' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫) উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত এ-সময়প্রবাহে মধ্যযুগের সাহিত্যের সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : আহমদ শরীফের 'সত্য কলি-বিবাদ সংবাদ বা যুগ-সংবাদ' (বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়, ১৯৫৯) ; 'মধুমালতী' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬০) : 'মুসলিম কবির পদ সাহিত্য' (বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৬১) ; 'শাহ্ বারিদ খানের গ্রন্থাবলী' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৬), 'মধ্য-যুগের রাগতালনামা' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭) ; 'চন্দ্রাবতী' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭) ; 'বাংলার সুফী সাহিত্য' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯) ; আলী আহমদের 'ইমাম বিজয়' (কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৯) ; মযহারুল ইসলাম ও আবদুল হাফিজের 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' (ঢাকা, ১৯৬৯), রাজিয়া সুলতানার 'গুলে বকাওলী' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০) এবং সৈয়দ আলী আহসানের 'মধুমালতী' (বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭০)।

৩৩ 'বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা', পৃ. ১৫০

৩৪ নীলিমা ইব্রাহিম, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক', (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪) পৃ. ২৬-২৭

৩৫ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' [প্রথম খণ্ড], (প্র. প্র ; ঢাকা : হাসি প্রকাশালয়, ১৯৬০) পৃ. ১৯

৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৩৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

৩৮ কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম—সাধনা', (প্র. প্র ; রাজশাহী : বাঙলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১) ''লেখকের নিবেদন''

৩৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪২

৪০ 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', ''অবতরণিকা'' থেকে উদ্ধৃত

৪১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬০

৪২ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র', (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২) ''ভূমিকা'' থেকে উদ্ধৃত

৪৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

৪৪ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ; ''পরিচিতি'', গোলাম সাকলায়েন, 'বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য', (দ্বি. সং ; ঢাকা, পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ১৯৬৯)

৪৫ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'বাংলা সাহিত্যের কথা' [দ্বিতীয় খণ্ড], (পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ; ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৩৭৪) 'মুখবন্ধ' থেকে উদ্ধৃত

৪৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৪৭ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' [দ্বিতীয় খণ্ড], (প্র. প্র ; ঢাকা : হাসি প্রকাশালয়, ১৩৭১) ''ভূমিকা'' থেকে উদ্ধৃত

৪৮ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক', (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭০) 'অবতরণিকা', পৃ. ৩

৪৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৩

৫০ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র', (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯) ''মুখবন্ধ'' থেকে উদ্ধৃত

৫১ মযহারুল ইসলাম, 'কবি হেরাত মামুদ', (প্র. প্র ; রাজশাহী : বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১) পৃ. ২৫

৫২ 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য'
''···গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যের এমন কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, যেখানে তাঁর কাব্যের কোনরকম রচনাকালজ্ঞাপক উক্তি আছে, অথবা যার লিপিকাল থেকে তাকে মধ্য-অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে মনে করা যায়···।'' পৃ. ১২৭

৫৩ আহমদ শরীফ, 'সৈয়দ সুলতান—তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ', (পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ ; ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭)

৫৪ পূর্বোক্ত, ''প্রস্তাবনা''-থেকে উদ্ধৃত

৫৫ মুনীর চৌধুরী, 'তুলনামূলক সমালোচনা', (প্র. প্র ; ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৯) দ্র. উৎসর্গ-পত্র

৫৬ 'পদ্মাবতী', পৃ. ১২ (ভূমিকা)

৫৭ ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান', (দ্বিতীয় মুদ্রণ ; ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ১৯৭৪) ''প্রসঙ্গ কথা''-থেকে উদ্ধৃত

৫৮ মমতাজুর রহমান তরফদার, 'বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি', (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১) ''বক্তব্য'' থেকে উদ্ধৃত

৫৯ মুহম্মদ আবদুল হাফিজ, 'লোককাহিনীর দিক্-দিগন্ত', (প্র. প্র ; রাজশাহী, ১৯৬৮)
[ক] ''লোককাহিনীর পাশ্চাত্য গবেষণার সাথে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা বুঝতে পারবেন যে আবদুল হাফিজ মূলতঃ স্টিথ থম্পসনের 'The Folktale' গ্রন্থটিকে অনুসরণ করেছে এবং সে কারণেই তার 'লোককাহিনীর দিক্-দিগন্তে' থম্পসনের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।'' [ভূমিকা : মযহারুল ইসলাম]
[খ] ''গ্রন্থটি রচনাকালে বিদেশি, বিশেষত মার্কিন গবেষকদের গ্রন্থাদির উপর আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে।'' [গ্রন্থকারের নিবেদন]

৬০ মুহম্মদ আবু তালিব, 'লালন শাহ্ ও লালন-গীতিকা' [প্রথম খণ্ড], (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮)
''সম্প্রতি লালন-সম্পর্কিত যে সব আলোচনা করা হ'য়েছে বা হচ্ছে, তাতে পূর্ব ধারণা অনুসারে লালনকে কায়স্থ-সন্তান মনে করে নিয়ে তাঁর ও তাঁর ধর্ম-মতের উপর যথেচ্ছ মতবাদ চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে।'' [গ্রন্থাভাষ]

৬১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৬২ মযহারুল ইসলাম, 'লোক কাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস', (প্র. প্র ; ঢাকা : ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৩৭৬) দ্র. ভূমিকা

৬৩ আনোয়ার পাশা, 'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা', (দ্বি. সং ; ঢাকা : ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৩৭৬)
''রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীতে মনের মধ্যে যে একটা গভীর সাড়া অনুভব করেছিলাম তারই ফল আমার এই গ্রন্থখানি। রবীন্দ্রসাহিত্যের যে-কোন একটি দিকের

সম্পর্কে কিছু লিখব এবং সেই হবে জন্মশতবর্ষপূর্তিতে কবিগুরুর উদ্দেশ্যে আমার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য--এমনি একটা আর্তি ছিল সেদিন মনে। কোনো দুর্মর পাণ্ডিত্যের দম্ভ নিয়ে এ বই আমি লিখিনি। আমার ভক্তি-ভালোবাসা এবং বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে কবিগুরুকে সমগ্র সত্তায় উপলব্ধি করতে চেয়েছি শুধু।" [প্রথম সংস্করণের ভূমিকা]

৬৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৬৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

৬৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

৬৭ সৈয়দ আকরম হোসেন, 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : দেশকাল ও শিল্পরূপ', (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯)
"এ-গ্রন্থ নিঃসন্দেহে পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রউপন্যাস আলোচকগণের পথিকৃতের-দাবীদার। অনেকটা একারণে এবং এর বক্তব্যের সাহসিকতার জন্য এটি আমরা বাঙলা বিভাগ থেকে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছি। আশাকরি এ গ্রন্থ পূর্ব পাকিস্তানী মননশীল সাহিত্যকর্মীদের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম হবে।" [অবতরণিকা : মুহম্মদ আবদুল হাই]

৬৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-১৭

৬৯ আহমদ কবির, 'রবীন্দ্রকাব্য : উপমা ও প্রতীক', (প্র. প্র ; ঢাকা : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য সমিতির পক্ষে---বর্ণমিছিল, ১৯৭৪) ভূমিকা-থেকে উদ্ধৃত

৭০ হুমায়ূন আজাদ, 'রবীন্দ্রপ্রবন্ধ : রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা'. (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩)

"আমার আলোচনার বিষয় তাঁর প্রবন্ধে প্রকাশিত রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা। তবে তাঁর সমস্ত প্রবন্ধগ্রন্থ আমার আলোচনায় গ্রহণ করা হয়নি। হলে ভালো হতো। তবু, আমার বিশ্বাস, এ গ্রন্থে যে রবীন্দ্রনাথকে পাই, তাতে সে রবীন্দ্রনাথের কোনো বদল ঘটতো না। এ গ্রন্থে আলোচিত প্রবন্ধগুলোর রচনাকাল ১৮৯১ থেকে১৯৪১।" ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত

৭১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

৭২ মুনীর চৌধুরী, 'মীর-মানস', (তৃ. মু ; ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৪), পৃ. ২০

৭৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৭৪ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, 'ভাষাশিল্পী মশাররফ', (প্র. প্র ; ঢাকা : ১৯৬৯) প্রসঙ্গ কথা-থেকে উদ্ধৃত

৭৫ রফিকুল ইসলাম, 'নজরুল-নির্দেশিকা', (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী,১৯৬৯)
"গবেষণাক্ষেত্রে রচনা-পঞ্জীর (Bibliography) গুরুত্ব অপরিসীম। কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য কর্মের প্রামাণ্য রচনা-পঞ্জীর অভাবে নজরুল সম্পর্কিত আলোচনা অনেক সময় স্মৃতি-নির্ভর, তথ্যনিরপেক্ষ, স্বকপোলকল্পিত ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়ে। 'নজরুল নির্দেশিকা' এ অভাব পূরণে কিছুটা সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।" মুখবন্ধ-থেকে উদ্ধৃত

৭৬ সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, 'জসীমউদ্‌দীন', (প্র. প্র ; ঢাকা : ইষ্ট পাকিস্তান পাবলিশার্স, ১৯৬৭)

"আলোচ্য গ্রন্থে আমি জসীমউদ্‌দীনের কবি প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণের সাথে সাথে তাঁর সামগ্রিক সাহিত্য কর্মের বিস্তৃত পরিচয় দানের প্রয়াস পেয়েছি। কবির সকল কাব্য ও কবিতার বিশ্লেষণ এবং বিচারণার চেষ্টা যেমন এতে রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাঁর লোকনাট্য ও বিবিধ গদ্যরচনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্য-সংবলিত আলোচনা।" "সবিনয়-নিবেদন"-অংশ থেকে উদ্ধৃত

৭৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

৭৮ সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কবি ফররুখ আহমদ', (প্র. প্র ; ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯) পৃ. ১৯

৭৯ সন্‌জীদা খাতুন, 'সত্যেন্দ্র-কাব্য পরিচয়', (প্রথম পাকিস্তানী সংস্করণ ; ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯) পৃ. ৪০৫

৮০ সৈয়দ আকরম হোসেন, 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ, (প্র. প্র ; ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১) লেখকের কথা-থেকে উদ্ধৃত

৮১ 'তুলনামূলক সমালোচনা', পৃ. ২৩৭

৮২ এ-সময়ে প্রকাশিত লোকাচার ও লোকসাহিত্যের সঙ্কলনগ্রন্থ এবং মধ্যযুগের সাহিত্যের সম্পাদনাগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আশরাফ সিদ্দিকীর 'কিংবদন্তীর বাংলা' (ঢাকা, ১৯৭৫) ও 'লোকায়ত বাংলা' (ঢাকা, ১৯৭৭), মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের 'হারামণি' (অষ্টম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'যশোরের লোককাহিনী' (বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪) এবং আহমদ শরীফের 'বাউল তত্ত্ব' (বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), 'হিন্দু কবির পদ সাহিত্য' (বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' (বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫) এবং 'সওয়াল সাহিত্য' (বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬)

৮৩ আহমদ শরীফ, 'বাঙালী ও বাঙলাসাহিত্য', (প্র. প্র ; ঢাকা : বর্ণমিছিল, ১৯৭৮) নিবেদন—অংশ থেকে উদ্ধৃত

৮৪ পূর্বোক্ত

৮৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

৮৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৩

৮৭ আবুল কাসেম ফজলুল হক, 'উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য', (প্র, প্র ; ঢাকা : খাঁন ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি ১৯৭৯) পৃ. ৪১

৮৮ আবদুল হাফিজ, 'বাংলা রোমান্স'-কাব্য পরিচয়', (প্র. প্র ; ঢাকা : (মুক্তাধারা, ১৯৭৬)

৮৯ আহমদ শরীফ, 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ', (প্র. প্র ; ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৭) দ্র. ভূমিকা

৯০ ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি', (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪)

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মরহুম প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই ছিলেন আমার গবেষণা নির্দেশক। তাঁর উপদেশমত আমি বাংলা লোকসাহিত্যে লোক-সংস্কৃতির উপাদান অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রধানতঃ মুসলমান লোকসমাজের বিষয় আলোচনা করেছি।" ঋণ-স্বীকার থেকে উদ্ধৃত

৯১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭ (ভূমিকা)

৯২ আবুল আহসান চৌধুরী, 'কুষ্টিয়ার বাউল সাধক', (প্র. প্র ; কুষ্টিয়া : গণলোক প্রকাশনী, ১৯৭৪) পৃ. ৮৭

৯৩ আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'শুদ্ধতম কবি', (প্র. প্র ; ঢাকা : নলেজ হোম, ১৯৭২) "বারোটি নিবন্ধ-বৃত্তে আমি জীবনানন্দ দাশের কবিতার শারীরবৃত্তিক আলোচনা করেছি। বিশদ আলোচনায় না-নেমে আমি কবির বিশিষ্টতাটিই ছেঁকে তুলতে চেয়েছি। আমার লক্ষ্য ছিলো সংক্ষিপ্তির দিকে—মূল বিষয়কে তার পরিসরে ধ'রে দেওয়া। সুতরাং জীবনানন্দের কবিতার সর্বাঙ্গীন বা বিশদ বিশ্লেষণ এ নয় ; আমার চোখে তাঁর বিশিষ্টতাগুচ্ছ বরং। সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও রচনাকে যথাসাধ্য সম্পূর্ণতা দিতেও চেয়েছি বটে।" প্রাসঙ্গিকী—থেকে উদ্ধৃত

৯৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৯৫ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, 'শিল্পীর রূপান্তর', (প্র. প্র ; ঢাকা : বর্ণমিছিল, ১৯৭৫) "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" পৃ. ৬৮

৯৬ পূর্বোক্ত, "নজরুল-কাব্যে শব্দ-ব্যবহার" পৃ. ১০৫

৯৭ আনিসুজ্জামান, 'স্বরূপের সন্ধানে', (প্র. প্র ; ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৭৬)

"বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে, বিভিন্ন উপলক্ষে ও ভাষায় লেখা এই প্রবন্ধ চতুষ্টয়ের মধ্যে সামান্য যোগসূত্র আছে। সবকটি রচনাতেই আমি সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে তার রচনাকালের সমাজকে অবলোকন করতে চেয়েছি।" নিবেদন-থেকে উদ্ধৃত

৯৮ রফিকুল ইসলাম, 'নজরুল জীবনী', (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২)

"বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রামাণ্য পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের অভাব বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছিল, সে অভাবপূরণের জন্যেই 'নজরুল জীবনী' রচনায় ব্রতী হয়েছিলাম।" মুখবন্ধ-থেকে উদ্ধৃত

৯৯ রফিকুল ইসলাম, 'কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা', (প্র. প্র ; ঢাকা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৮২) পৃ. ৩০৪

১০০ সিদ্দিকা মাহমুদা, 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা : চেতনা ও চিত্রকল্প', (প্র. প্র ; ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮১) পৃ. ৫

১০১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫

১০২ "বাংলাদেশের প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্য [১৯৭২-১৯৭৯]", পূর্বোক্ত

১০৩ 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১

১০৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

১০৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭

১০৬ মুহম্মদ মজির উদ্দীন, 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশ-চেতনা', (প্র. প্র ; ঢাকা : সিটি লাইব্রেরী, ১৯৭৮) পৃ. ৯৩—৯৪

১০৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

১০৮ সন্‌জীদা খাতুন, 'রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ্', (প্র. প্র ; ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮১) পৃ. ৫

১০৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

১১০ গোলাম মুরশিদ, 'রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ : পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা', (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮১)
"১৯৭৩ সালের এপ্রিলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা-মালা'র ওপর নির্ভর করে বর্তমান গ্রন্থ রচিত হয়েছে।" [কৃতজ্ঞতা-স্বীকার]

১১১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১-০২

১১২ বেগম আক্তার কামাল, 'বিষ্ণু দে-র কাব্য : পুরাণ প্রসঙ্গ', (প্র. প্র ; ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৭) পৃ. ২০-২১

১১৩ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, 'মীর মশাররফের গদ্য রচনা', (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫) পৃ. ৭৬

১১৪ নাজমা জেসমিন চৌধুরী, 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি', (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮০)
"স্বভাবতই আমাদের আলোচনা নন্দনতাত্ত্বিক নয়, দৃষ্টিভংগিটা মূলতঃ সমাজ-তাত্ত্বিক ; তথাপি রচনার শিল্পমূল্য উপেক্ষা করা হয়নি, কেননা আলোচনা সাহিত্যিক না-হলেও অবশ্যই সাহিত্যকে নিয়ে।" গ্রন্থকারের শিরোনামাহীন বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত

১১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ২

১১৬ মোরশেদ শফিউল হাসান, 'বেগম রোকেয়া : সময় ও সাহিত্য', (প্র. প্র ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২)
"রোকেয়া জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে এ বইটি লিখিত হয়েছে। বেগম রোকেয়ার জীবন ও রচনাকর্মের সামগ্রিক কোনো মূল্যায়ন নয়, সমকালের পটভূমিতে তাঁর চিন্তা ও সাহিত্য-চর্চার মোটামুটি একটা পরিচয় পাঠক সাধা-রণের কাছে তুলে ধরাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আমার উদ্দেশ্য।" নিবেদন—থেকে উদ্ধৃত

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি

১৯২৪

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ : 'পারস্য-প্রতিভা', প্রথম প্রকাশ ১৯২৪, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩১, ফিনিক্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ২৯ নং কালীদাস সিংহের লেন, কলিকাতা ; ষষ্ঠ সং, ১৯৬৪, গ্রেট ইষ্ট লাইব্রেরী, ঢাকা।

১৯৩৫

মুহম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ : 'আরাকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য', প্র. প্র ; ১৯৩৫, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

১৯৫৩

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : 'বাংলা সাহিত্যের কথা', [প্রথম খণ্ড], প্র. প্র ; এপ্রিল ১৯৫৩, পরিমার্জিত পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৮০, রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, ঢাকা।

১৯৫৬

মুহম্মদ আবদুল হাই এবং সৈয়দ আলী আহসান : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', [আধুনিক যুগ], প্র. প্র ; জুন ১৯৫৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯৫৭

মুহম্মদ এনামুল হক : 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', প্র. প্র ; ১৯৫৭, তৃ. সং ১৯৬৮, পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স, ঢাকা।

১৯৬০

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', [প্রথম খণ্ড], প্র. প্র ; ১৯৬০, হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা।

১৯৬১

কাজী আবদুল মান্নান : 'আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা', প্র. প্র ; সেপ্টেম্বর ১৯৬১, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

গোলাম সাকলায়েন : 'ফকীর গরীবুল্লাহ্', প্র. প্র ; চৈত্র ১৩৬৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মযহারুল ইসলাম : 'কবি হেয়াত মামুদ', প্র. প্র ; ১৯৬১, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১৯৬২

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : 'আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র', প্র. প্র ; আগস্ট ১৯৬২, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯৬৩

আনোয়ার পাশা : 'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা' [প্রথম খণ্ড], প্র. প্র ; কার্তিক ১৩৭০, দ্বি. সং ভাদ্র ১৩৭৬, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

আনোয়ারুল করিম : 'বাউল কবি লালন শাহ্', প্র. প্র ; ১৯৬৩, দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সং জুলাই ১৯৬৬, মিল্কী হাউস, কুষ্টিয়া।

আশরাফ সিদ্দিকী : 'লোক-সাহিত্য', প্র. প্র ; নভেম্বর ১৯৬৩, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

১৯৬৪

আনিসুজ্জামান : 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', প্র. প্র ; অক্টোবর ১৯৬৪, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা।

গোলাম সাকলায়েন : 'বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য', প্র. প্র ; ডিসেম্বর ১৯৬৪, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, দ্বি. সং এপ্রিল ১৯৬৯, পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ঢাকা।

নীলিমা ইব্রাহিম : 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক' প্র. প্র ; ১৯৬৪, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' [দ্বিতীয় খণ্ড], প্র. প্র ; বৈশাখ ১৩৭১, হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : 'বাংলা সাহিত্যের কথা' [দ্বিতীয় খণ্ড], প্র. প্র ; ফাল্গুন ১৩৭১, পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত সং কার্তিক ১৩৭৪, রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, ঢাকা।

১৯৬৫

মুনীর চৌধুরী : 'মীর-মানস', প্র. প্র ; এপ্রিল ১৯৬৫, তৃ. মুদ্রণ জুন ১৯৭৪, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', প্র. প্র ; জুন ১৯৬৫, দ্বি. সং জুলাই ১৯৬৯ ; তৃ. সং ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হাসান হাফিজুর রহমান, 'আধুনিক কবি ও কবিতা' প্র. প্র; ১৯৬৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৬৭

আতাউর রহমান : 'নজরুল কাব্য-সমীক্ষা', প্র. প্র ; ১৯৬৭ ; দ্বি. সং ১৯৭১, তৃ. সং ১৯৭৪, মুক্তধারা, ঢাকা।

আনোয়ার পাশা : 'সাহিত্য শিল্পী আবুল ফজল', প্র. প্র ; জুলাই ১৯৬৭, বইঘর, চট্টগ্রাম।

গোলাম সাক্‌লায়েন : 'মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক', প্র. প্র ; আগস্ট ১৯৬৭, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

মযহারুল ইসলাম : 'ফোকলোর পরিচিতি এবং লোক সাহিত্যের পঠন-পাঠন', প্র. প্র ; আগস্ট ১৯৬৭, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় : 'জসীমউদ্‌দীন', প্র. প্র ; ১৯৬৭, ইষ্ট পাকিস্তান পাবলিশার্স, ঢাকা।

১৯৬৮

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', প্র. প্র ; এপ্রিল ১৯৬৮, মিত্র সংঘ, রাজশাহী।

মুহম্মদ আবদুল হাফিজ : 'লোককাহিনীর দিক্-দিগন্ত', প্র. প্র ; ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।

মুহম্মদ আবূ তালিব : 'লালন শাহ্ ও লালন-গীতিকা' [প্রথম খণ্ড], প্র. প্র ; জুন ১৯৬৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সৈয়দ আলী আহসান : 'পদ্মাবতী', প্র. প্র ; মে ১৯৬৮, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

১৯৬৯

আনিসুজ্জামান : 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র', প্র. প্র ; নভেম্বর ১৯৬৯, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

মযহারুল ইসলাম : 'লোক কাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস', প্র. প্র ; বৈশাখ ১৩৭৬, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

মুনীর চৌধুরী : 'তুলনামূলক সমালোচনা', প্র. প্র ; অক্টোবর ১৯৬৯, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল : 'ভাষাশিল্পী মশাররফ', প্র. প্র ; জানুয়ারী ১৯৬৯, ১১/১ টয়েনবি সারকুলার রোড, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম : 'নজরুল নির্দেশিকা', প্র. প্র ; মে ১৯৬৯, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

সন্‌জীদা খাতুন : 'সত্যেন্দ্র-কাব্য পরিচয়', প্রথম পাকিস্তানী সংস্করণ জুন ১৯৬৯, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় : 'কবি ফররুখ আহমদ', প্র. প্র ; জুন ১৯৬৯, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন : 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : দেশকাল ও শিল্পরূপ', প্র. প্র ; এপ্রিল ১৯৬৯, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯৭০

আবুল হাসানাত : 'মুসলিম রচিত উপন্যাস', প্র. প্র ; ফেব্রুয়ারী ১৯৭০, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমদ : 'বাংলা রোমাণ্টিক প্রণয়োপাখ্যান', প্র. প্র ; মে ১৯৭০, দ্বি. মু ; সেপ্টেম্বর ১৯৭০, খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ঢাকা।

মুহম্মদ মজির উদ্দীন : 'বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা', প্র. প্র ; সেপ্টেম্বর ১৯৭০, নর্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স, নওগাঁ, রাজশাহী।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক', প্র. প্র ; জুন ১৯৭০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৭১

আনোয়ারুল করিম : 'বাউল সাহিত্য ও বাউল গান', প্র. প্র ; ফেব্রুয়ারী ১৯৭১, লোক-সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র, কুষ্টিয়া।

মমতাজুর রহমান তরফদার : 'বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি', প্র. প্র ; জানুয়ারী ১৯৭১, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯৭২

আবদুল মান্নান সৈয়দ : 'শুদ্ধতম কবি', প্র. প্র ; আগস্ট ১৯৭২, নলেজ হোম, ঢাকা।

আহমদ শরীফ : 'সৈয়দ সুলতান—তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ' [পরিচিতি খণ্ড], প্র. প্র ; নভেম্বর ১৯৭২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

নীলিমা ইব্রাহীম : 'বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা', প্র. প্র ; ভাদ্র ১৩৭৯, নওরোজ কিতা-বিস্তান, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম : 'নজরুল জীবনী', প্র. প্র ; মে ১৯৭২, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯৭৩

শামসুল হক : 'বাংলা সাময়িক-পত্র', প্র. প্র ; ১৯৭৩, গ্রন্থায়ন, ঢাকা।

হুমায়ূন আজাদ : 'রবীন্দ্রপ্রবন্ধ : রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা', প্র. প্র ; ১৯৭৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৭৪

আবুল আহসান চৌধুরী : 'কুষ্টিয়ার বাউল সাধক', প্র. প্র ; জানুয়ারী ১৯৭৪, গণলোক প্রকাশনী, কুষ্টিয়া।

আহমদ কবির : 'রবীন্দ্রকাব্য : উপমা ও প্রতীক', প্র. প্র ; সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে—বর্ণমিছিল, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমদ : 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি', প্র. প্র ; অক্টোবর ১৯৭৪, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

মনসুর মুসা : 'পূর্ব বাঙলার উপন্যাস', প্র. প্র ; এপ্রিল ১৯৭৪, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা।

১৯৭৫

আবু হেনা মোস্তফা কামাল : 'শিল্পীর রূপান্তর', প্র. প্র ; নভেম্বর ১৯৭৫, বর্ণমিছিল, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল : 'মীর মশাররফের গদ্য রচনা', প্র. প্র ; আগস্ট ১৯৭৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৭৬

আনিসুজ্জামান : 'স্বরূপের সন্ধানে', প্র. প্র ; সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

আনোয়ারুল করিম : 'ফকির লালন শাহ্', প্র. প্র ; মার্চ ১৯৭৬, লালন একাডেমী, কুষ্টিয়া।

আবদুল কাদির : 'কাজী আবদুল ওদুদ', প্র. প্র ; মে ১৯৭৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবদুল হাফিজ : 'বাংলা রোমান্স-কাব্য পরিচয়', প্র. প্র ; জুন ১৯৭৬, মুক্তধারা, ঢাকা।

১৯৭৭

আতোয়ার রহমান : 'বাংলাদেশের শিশু পত্রিকা' [বৃটিশ যুগ] প্র. প্র ; আগস্ট ১৯৭৭ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আহমদ শরীফ : 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ', প্র. প্র ; এপ্রিল ১৯৭৭, মুক্তধারা, ঢাকা।

বেগম আক্তার কামাল : 'বিষ্ণু দে-র কাব্য : পুরাণ প্রসঙ্গ', প্র. প্র ; আগস্ট ১৯৭৭, মুক্তধারা, ঢাকা।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত', প্র. প্র ; ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৭৮

আনোয়ার পাশা : 'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা' [দ্বিতীয় খণ্ড], প্র. প্র ; মে ১৯৭৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আহমদ শরীফ : 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', প্র. প্র ; ডিসেম্বর ১৯৭৮, বর্ণমিছিল, ঢাকা।

মুহম্মদ মজির উদ্দীন : 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশ-চেতনা', প্র. প্র ; সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : 'বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা', প্র. প্র ; সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯৭৯

আবুল কাসেম ফজলুল হক : 'উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য', প্র. প্র ; আগস্ট ১৯৭৯, খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ঢাকা।

১৯৮০

আবদুল মান্নান সৈয়দ : 'দশ দিগন্তের দ্রষ্টা', প্র. প্র ; নভেম্বর ১৯৮০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

নাজমা জেসমিন চৌধুরী : 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি', প্র. প্র ; জুন ১৯৮০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৮১

গোলাম মুরশিদ : 'রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ : পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা', প্র. প্র ; জুন ১৯৮১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : 'সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত', প্র. প্র ; জুন ১৯৮১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সন্‌জীদা খাতুন : 'রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ্', প্র. প্র ; আগস্ট ১৯৮১, মুক্তধারা, ঢাকা।

সিদ্দিকা মাহমুদা : 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা : চেতনা ও চিত্রকল্প', প্র. প্র ; ফেব্রুয়ারী ১৯৮১, মুক্তধারা, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন : 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ', প্র. প্র ; মে ১৯৮১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সৈয়দ আবুল মকসুদ : 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য', প্র. প্র ; ডিসেম্বর ১৯৮১, মিনার্ভা বুক্‌স, ঢাকা।

১৯৮২

আবুল কাসেম চৌধুরী : 'বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্‌শা : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা', প্র. প্র ; ফেব্রুয়ারী ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোরশেদ শফিউল হাসান : 'বেগম রোকেয়া : সময় ও সাহিত্য' প্র. প্র ; এপ্রিল ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম : 'কাজী নজরুল ইসলাম ; জীবন ও কবিতা', প্র. প্র ; এপ্রিল ১৯৮২, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা।